কুশলপ্রশ্নোত্তর

লেখক- ভদন্ত এস. ধাম্মিকা

অনুবাদকঃ- অধ্যাপক ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া

প্রথম প্রকাশ

মে, ২০০৪ সাল, ২৫৪৮ বুদ্ধাব্দ

দ্বিতীয় প্রকাশ

৮ জানুয়ারী, ২০০৬ সাল

শ্রদ্ধাদানঃ- ৩০.০০টাকা

....

নিবেদন

১৯৮৭ সালে প্রকাশিত, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বৌদ্ধদর্শন বিষয়ে বিদগ্ধ লেখকের প্রবন্ধ অবলম্বনে, ভদন্ত শ্রাবস্তী ধাম্মিকা মহোদয় প্রণীত, গুড কোয়েশ্চন গুড আনসারস বইটির অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা মেটাতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

বুড্ডিস্ট এসোসিয়েশন, ইউনাইটেড স্টেট এর সহায়তায় সম্প্রতি বইটির ইংরেজী সংকলন আমেরিকার পাঠকগণের কাছে সহজলভ্য হয়েছে। নিউয়র্ক বুড্ডিস্ট বিহার লাইব্রেরীর সৌজন্যে পাওয়া এই বই এর ইংরেজী সংকলনটি পাঠ করে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য বইটি বাংলায় অনুবাদ করতে আগ্রহী হই। মূলগ্রন্থে আলোচিত বিষয়কে সহজবোধ্য এবং ব্যাখ্যা করার জন্য অনুবাদের সময় শব্দানুবাদের চেয়ে ভাবানুবাদের দিকে সমধিক গুরূত্ব দিয়েছি। বইটি পাঠ করে আমি আশাকরি পাঠক জীবনমুখী বিভিন্ন প্রশ্নের মনোরম উত্তর খুজেঁ পেয়ে শংশয়মুক্ত হবার আনন্দ উপভোগ করবেন।

পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখী হোক।

অধ্যাপক অরবিন্দ বড়ুয়া

বৌদ্ধধর্ম

প্রশ্নঃ-বৌদ্ধধর্ম কি?

উত্তরঃ 'বৌদ্ধ' শব্দটি 'বোধ' শব্দ থেকে উদ্ভূত। 'বোধি' বলতে জাগ্রত হওয়া বুঝায় তাই, বৌদ্ধধর্ম জাগ্রত হবার দর্শন। মানবপুত্র সিদ্ধার্থ গৌতম ৩৫ বছর বয়সে ব্যক্তিগত সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা দর্শনে জাগ্রত হয়েছিলেন। এই ঘটনা আজ থেকে ২৫৪৮ বছর আগের। বর্তমানে সারা বিশ্বে অসংখ্য মানুষ এই দর্শনের অনুসারী। একশত বছর আগে এই ধর্ম শুধুমাত্র এশিয়া মহাদেশে সীমাবদ্ধ ছিল।

প্রশ্নঃ-বৌদ্ধধর্ম কি তাত্ত্বিক দশর্ন?

উত্তরঃ দর্শনের প্রতিশব্দ ফিলজপি শব্দটি ফিলো এবং সোপিয়া এই দুটি ল্যাটিন শব্দ থেকে এসেছে। ফিলো শব্দের অর্থ ভালোবাসা এবং সোপিয়া অর্থ প্রজ্ঞা। ফিলোজপি বলতে বুঝায় প্রজ্ঞা উদ্ভূত ভালোবাসা। প্রকৃতপক্ষে এটিই বৌদ্ধধর্মের মূল বাণী। বৌদ্ধধর্ম মানুষের বুদ্ধি ও মেধাশক্তি বিকশিত করে জীবনের স্বরূপ বুঝতে সাহায্য করে। এতে আমরা সকল জীবের প্রতি মৈত্রী-করুণায় উদ্ভূত হই। তাই বৌদ্ধধর্ম শুধুমাত্র তাত্ত্বিক দর্শন নয় বরং জীবনমূখী বাস্তব দর্শন।

প্রশ্নঃ-বুদ্ধ কে ছিলেন?

উত্তরঃ ৬২৪ খ্রীষ্টঃ পূর্বে ভারতের এক রাজপরিবারের এক শিশুর জন্ম হয়। রাজ ঐশ্বয্য ও বিলাসে লালিত হলেও কালক্রমে তাঁর এই উপলব্ধি হয় যে, রাজ ঐশ্বর্য প্রকৃত সুখ-শান্তি দিতে পারে না। চারপাশের মানুষের নানা দুঃখ যন্ত্রনা দেখে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। জীবের দুঃখ ও দুঃখের কারণ থেকে মুক্তির উপায় উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে ২৯ বছর বয়সে স্ত্রী-পুত্র, মা-বাবা, রাজ ঐশ্বয্যের বিলাস বহুল জীবন ত্যাগ করে অনিশ্চিত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি সংসার ত্যাগ করেন। তৎকালীন মুনী-ঋষিদের কাছে দুঃখমুক্তির সঠিক

সমাধান না পেয়ে অবশেষে তিনি নিজেই সমাধান উদঘাটনের জন্য কঠোর সাধনায় মগ্ন হন। দীর্ঘ ৬ বছরের কঠোর সাধনার পর আপন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞাত হন। অজ্ঞতা দূর করে জ্ঞান উপলব্ধি করেন বলে তিনি বুদ্ধ রূপে আখ্যায়িত হন। এরপর মহাপ্রয়ান পযর্ন্ত ৪৫ বছর ধরে সমগ্র উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করে তাঁর লব্ধ জ্ঞান প্রচার করেন। তাঁর চরিত্রের অনাবিল ধৈয্য, মৈত্রী, করূণার মহিমায় তিনি সকলের কাছে মহিমান্বিত হয়ে উঠেন। পরিশেষে ৮০ বছর বয়সে জীবন জগতের অপ্রতিরোধ্য বার্ধক্য ও রোগে আক্রান্ত হলেও পরম সুখশান্তি নিয়ে দেহত্যাগ করেন।

প্রশ্নঃ- আপন স্ত্রী-পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ না করে সংসার ত্যাগ করা দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার পরিচয় নয় কি?

উত্তরঃ তাঁর পক্ষে পরিজনদের ছেড়ে যাওয়া মোটেই সহজ কাজ ছিল না। সংসার ত্যাগের আগে দীর্ঘদিন এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি সংকটে পড়েন। তাঁর কাছে দুটি পথ খোলা ছিল, একদিকে রাজ ঐশ্বয্যের সুখবিলাসে পরিজনের জন্য জীবনযাপন করবেন নাকি বিশ্বের মানুষের কল্যাণের জন্য জীবন যাপন করবেন? অবশেষে তাঁর করুণাদ্র হৃদয় বিশ্বের মানুষের কল্যাণ ও জীবের দুঃখ মুক্তির জন্য তাঁকে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর এই আত্মত্যাগ কি দ্বয়িত্ব জ্ঞানহীনতার পরিচায়ক হতে পারে? আসলে এটি ছিল ঐতিহাসিক আত্মত্যাগ যার শুভফল এখনও জগতের মানুষ অবিরত লাভ করে যাচ্ছে।

প্রশ্নঃ- বুদ্ধ তো বেঁচে নেই। তিনি কিভাবে আমাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করবেন?

উত্তরঃ পদার্থ বিজ্ঞানী ফ্যারাডে বিদ্যুত শক্তি আবিষ্কার করেন। এখন তিনি বেঁচে নেই, কিন্তু তাঁর আবিষ্কার কি এখনও আমাদের উপকার করে যাচ্ছে না? চিকিৎসা বিজ্ঞানী লুইস পাস্তুরের আবিষ্কার অদ্যাবধি রোগ নিরাময়ে কাজ করছে, তিনি তো এখন নেই। লিওনার্দো ভিন্সির শিল্পকর্ম তাঁর মৃত্যুর এত দীর্ঘ সময় পরেও মানুষকে আনন্দ দিয়ে

যাচ্ছে। মনীষীদের মৃত্যু হয়; কিন্তু তাঁদের অবদান বা কর্মফসল যুগযুগ ধরে আমাদের অনুপ্রাণিত করে দিক নির্দেশনা দেয়। বুদ্ধ এখন জীবিত নেই, কিন্তু তাঁর শিক্ষা, জীবনাদর্শ ও উপদেশাবলী আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ও সমস্যা উত্তরণের প্রেরণা দিয়ে জীবনধারা বদলে দিচ্ছে। মৃত্যুর পরেও বুদ্ধের মতো মহাপুরুষের কীর্তি শত শত শতাব্দী ধরে এই ক্ষমতা ধারণ করে।

প্রশ্নঃ- বুদ্ধ কি ঈশ্বর ছিলেন?

উত্তরঃ না, বুদ্ধ স্বয়ং ঈশ্বর, ঈশ্বরের প্রেরিত সন্তান কিংবা ঈশ্বরের প্রেরিত দূত ছিলেন না। আমাদের সবার মতো তিনি একজন মানুষ, একজন মানবপুত্র। নিজ কর্মসাধনার অভিজ্ঞতার অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করে জগত জীবনের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞাত হয়ে তিনি জ্ঞানের আলোকে প্রজ্ঞাবান হয়েছিলেন। উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছিলেন, তাঁর উদ্ঘাটিত জ্ঞানের পথে জীবনাচরণ করে যে কোন ব্যক্তি তাঁর মতো বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভ করে প্রকৃত সুখ-শান্তি লাভ করতে পারেন।

প্রশ্নঃ- বুদ্ধ যদি ঈশ্বর না হন, তাহলে তাঁকে প্রার্থনা করা হয় কেন?

উত্তরঃ বিভিন্ন পদ্ধতির প্রার্থনা আছে। একপ্রকার প্রার্থনা আছে, যেখানে প্রার্থনাকারী তাঁদের ঈশ্বরের নিকট শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়ে অভিষ্ট পূরণের জন্য প্রার্থনা করেন। এই আশা নিয়ে যে, ঈশ্বর তা শুনে পুরণ করবেন। এইরূপ প্রার্থনায় কোন বৌদ্ধ বিশ্বাসী নন। অন্য এক প্রার্থনা পদ্ধতিতে অনুসারীগণ তাঁদের পূজ্য ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যেইভাবে ছাত্ররা তাঁদের শিক্ষককে দাঁড়িয়ে কিংবা জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত গীতি হবার সময় সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। বৌদ্ধরা এই শেষোক্ত পদ্ধতিতে বুদ্ধকে সম্মান প্রদর্শন করে পূজা করে থাকেন।

প্রশ্নঃ- শোনা যায় বৌদ্ধরা পুত্তলিকা পূজা করেন। তা কি সত্য?

উত্তরঃ একথা সত্য নয়। পুত্তলিকা বলতে বুঝায় প্রতিমূতি বানিয়ে ঈশ্বর কিংবা দেব দেবী রুপে পূজা করা। কিন্তু বৌদ্ধরা বুদ্ধকে ঈশ্বর মনে করেন না। তাই ঐ কথা ভুল, সঠিক নয়। সাধারণতঃ বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা তাঁদের বিশ্বাসকে কোন প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেন। যেমন তাওধর্মে বৈপরীত্যের মধ্যে ঐক্যের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেন "ওয়াইন ইয়ং", শিখধর্মে আধ্যাত্মিক সংগ্রামে প্রতীক হিসেবে তলোয়ার এবং খ্রীষ্টধর্মে যীশুর উপস্থিতিকে মাছ হিসেবে, যীশুর আত্মত্যাগের প্রতীক হিসেবে ক্রুশচিহ্ন ব্যবহার করে থাকেন। পদ্মাসনে বসা, হাত দুটি আলতোভাবে কোলে রাখা, করুণসিক্ত মৃদু হাসি-মাখা মুখমন্ডলের বুদ্ধমূর্তির প্রতীকটি বৌদ্ধদের হৃদয়ে প্রেম ভালবাসা করুণা মৈত্রী জাগানোর প্রেরণা যোগায়। পূজার্ঘ্য ধূপের সৌরভ সৎগুণাবলীর সুপ্রভার কথা, প্রজ্জলিত মোমবাতির শিখা জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হবার এবং পূজার খাদ্যদ্রব্যকে প্রসাদ হিসেবে ভোগ না করে ত্যাগের চেতনা গড়ে তোলার এবং সকাল বেলায় অর্পিত ফুলের সৌন্দর্য বিকালে কিভাবে ক্রমশঃ ম্লান হয়ে যায় তার মধ্য দিয়ে যৌবনের দেহকান্তির অনিত্য ও অস্থায়ীত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় বৌদ্ধ পূজারীকে। বুদ্ধের মূর্তির সামনে বৌদ্ধদের প্রণাম নিবেদনের অর্থ, বুদ্ধের যে দুঃখমুক্তির শিক্ষা, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা হয়। এইসব হলো বৌদ্ধদের প্রার্থনা ও পূজার অন্তঃর্নিহিত উদ্দেশ্য। বুদ্ধের মূর্তিকে বুদ্ধের মানবিকতা লাভের প্রতীক হিসেবে এখানে ব্যবহার করা হয়। প্রত্যক মানুষের মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত আছে এই শক্তি বিকাশের জন্য বাইরে নয়; অন্তঃর্লোকে দৃষ্টি ফেরাতে হয়। বৌদ্ধদর্শন ঈশ্বর কেন্দ্রিক নয় এটি মানব কেন্দ্রিক, এই বিষয় পূজার মধ্য দিয়ে বৌদ্ধরা উপলদ্ধি করার চেষ্টা করেন।

প্রশ্নঃ- বৌদ্ধরা বৌদ্ধমন্দিরে কাগজের টাকা পোড়ানো সহ ঐ ধরণের অনুষ্ঠান করেন কেন?

উত্তরঃ কোন বিষয় সম্পর্কে সঠিক না জেনে সেই সম্পর্কে ধারণা করা উচিত নয়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, বৌদ্ধদের জীবনাচরণে কিছু

কিছু বৌদ্ধদর্শন পরিপন্থী সংস্কার ও বিকৃত বিশ্বাস প্রচলিত আছে। বস্তুতঃ প্রত্যক ধর্মেই এই ধরণের কিছু কুসংস্কার থাকে। এজন্য মূল ধর্মদর্শনকে দায়ী করা যায় না। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধ নিজেই স্পষ্টভাবে বলেছেন। বৌদ্ধদর্শনের ব্যাখ্যা বুঝতে কেউ অক্ষম হয়ে ভুল আচরণ করলে, তজ্জন্য বুদ্ধকে দায়ী করা যায় না। এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যঃ

"চিকিৎসক থাকা সত্ত্বেও রোগী যদি চিকিৎসা না নিয়ে রোগযন্ত্রণা ভোগেন, তার জন্য চিকিৎসক দায়ী নন।" "কেউ যদি বুদ্ধ দেশিত দুঃখমুক্তির উপদেশ যথার্থ আচরণ না করে দুঃখ ভোগ করেন তার জন্য বৌদ্ধদর্শন দায়ী নয়।"(জাতক নিদান ২৮-৯)কোন ধর্মের অনুসারী যদি নিজ ধর্মের নির্দেশিত জীবনাচরণ অনুশীলন না করে বিপথগামী হয়, তাহলে তা দিয়ে ঐ ধর্মদর্শনের মূল্যায়ন করা উচিত নয়। বৌদ্ধদর্শনকে সম্যকভাবে বুঝতে হলে, বুদ্ধের নির্দেশিত শিক্ষা সম্পর্কে জানতে হবে, এ বিষয়ে লিখিত গ্রন্থাদি পাঠ করতে হবে, যাঁরা বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞাত তাঁদের সাথে আলোচনা করতে হবে।

প্রশ্নঃ- বৌদ্ধ জীবনাচরণ কল্যাণকর হলে বৌদ্ধ দেশগুলি দরিদ্র কেন?

উত্তরঃ দরিদ্র বলতে যদি আপনি আর্থিক দারিদ্র্য বুঝেন, তাহলে কিছু বৌদ্ধদেশ দরিদ্র। পক্ষান্তরে দরিদ্র বলতে যদি আপনি জীবন মনের দারিদ্র্য বোঝেন, তাহলে বৌদ্ধদেশ সমৃদ্ধ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আমেরিকা অতি ধনী ও শক্তিশালী দেশ, কিন্তু এখান হতে অপরাধমূলক ঘটনার পরিসংখ্যান অধিক। পিতা মাতারা তাঁদের সন্তানের সেবা বঞ্চিত হয়ে বৃদ্ধ বয়সে একাকীত্বের যন্ত্রনা ভোগ করে বৃদ্ধাশ্রমে মৃত্যুবরণ করেন। পারিবারিক সহিংসতা, শিশুনির্যাতন, প্রতি তিনটি দম্পতির মধ্যে একটি করে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা, সহজলভ্য পর্ণোগ্রফি, যৌন অনাচারের নৈতিক অধঃপতন নিয়ে আমেরিকা সমৃদ্ধ। এই দেশের মানুষ অর্থশালী বটে কিন্তু শান্তি বঞ্চিত। বৌদ্ধ দেশ মায়ানমার(বার্মা)প্রসঙ্গে দেখা যাবে, এ দেশের মানুষ আর্থিকভাবে তেমন সমৃদ্ধ নয়; কিন্তু সন্তানেরা মা-বাবাকে সম্মান ও সেবা যত্ন

করে। এদেশে অপরাধের পরিসংখ্যান হার কম, বিবাহ বিচ্ছেদ, পারিবারিক সহিংসতা, শিশু নির্যাতন, আত্মহত্যার ঘটনা নেই বললেই চলে। পর্ণোগ্রফি, যৌন অনাচার কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত। সার্বিক মূল্যায়নে এইদেশ আর্থিকভাবে কিছুটা পশ্চাদপদ হলেও নৈতিক দিক থেকে যে সমৃদ্ধ একথা অনস্বীকার্য। উপরন্তু আর্থিক উন্নয়নের বিচারে জাপান এখন বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ, যেখানে ৯৩ শতাংশ মানুষ নিজেদের বৌদ্ধ বলে পরিচয় দেয়।

প্রশ্নঃ- বৌদ্ধ কর্তৃক জনহিতকর কর্ম সম্পাদনের কথা তেমন শোনা যায় না কেন?

উত্তরঃ এর প্রধান কারণ হয়তো আত্মপ্রচারণায় বুদ্ধ অনুসারীরা বেশী আগ্রহী নন। কিছুদিন আগে জাপানী বৌদ্ধ নেতা নিক্কো নিওয়ানো ধর্মীয় জনগোষ্ঠির মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় "টেমপ্লেটন" পুরষ্কারে সম্মানিত হয়েছেন। থাই বৌদ্ধ ভিক্ষু মাদকাসক্তি রোধ আন্দোলনে সফলতার স্বীকৃতি স্বরূপ "ম্যাগাসেয়াসে" পুরষ্কার লাভ করেন। ১৯৮৭ সালে থাই বৌদ্ধ ভিক্ষু কান্তায়া পিয়াট্ গ্রামাঞ্চলে অনাথ শিশুদের সেবাকাজের জন্য “নরওয়েযান চিল্ড্রেন পীস্ প্রাইজে” ভূষিত হন। পাশ্চাত্যের বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারকগণ ভারতের গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য মোচনে বহুমূখী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে রত আছেন। তাঁরা স্কুল, শিশু সংগঠন, দাতব্য চিকিৎসালয়, কুঠিরশিল্প গড়ে তুলেছেন। দুঃখক্লিষ্ট অভাবগ্রস্থদের সেবা-প্রদান বৌদ্ধদের ধর্মীয় আচারের অন্তঃর্ভূক্ত। এই জনহিতকর কাজগুলি নীরবে নিভৃতে সম্পাদন করাতে তাঁরা বিশ্বাসী। এই কারণে হয়তো বৌদ্ধদের জনহিতকর কার্যকলাপের কথা তেমন শোনা যায় না।

প্রশ্নঃ- বৌদ্ধ ধর্মমতে এত শ্রেণীবিন্যাস কেন?

উত্তরঃ বাজারে নানা প্রকারের চিনি, সাদা চিনি, বাদামী চিনি, দানা চিনি, পাথুরে চিন, তরলচিনি, হিমায়িত চিনি পাওয়া যায়। এক কথায় সবই চিনি এবং মিষ্টি। বিভিন্নভাবে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন প্রকারের চিনি

তৈরী করা হয়েছে। ব্যপারটি বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এখানে আছে থেরবাদী বৌদ্ধ, জেন্ বৌদ্ধ, যোগচার বৌদ্ধ, বজ্রযান বৌদ্ধ প্রভৃতি। কিন্তু সবার মধ্যে এক অভিন্ন আদর্শবাদ বিদ্যমান। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন সংস্কৃতির সংগে সহবস্থানের প্রয়োজনে বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থে আত্মপ্রকাশ করেছে। মাঝে মাঝে যুগের পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার প্রয়োজনে এর পুনর্মূল্যায়নও করা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধধর্মের শ্রেণীবিন্যাসকে ভিন্ন মনে হলেও সকল শাখাগুলি প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্মের মূল আবেদন- "চতুরার্য সত্য" ও "আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গের" আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য ধর্মের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের মতো বৌদ্ধ অঙ্গ বা শাখাগুলি কখনও পরস্পরের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘাতে লিপ্ত হয়নি। এক বৌদ্ধ জনগোষ্ঠি অন্য বৌদ্ধ জনগোষ্ঠির উপসনালয়ে যাতায়াত এবং একত্রে প্রার্থনা করেন। এইরূপ সহ-অবস্থানের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যান্য অনেক ধর্মগোষ্ঠির মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না।

প্রশ্নঃ- আপনি কি বৌদ্ধ হিসেবে বৌদ্ধধর্মকে শ্রেষ্ঠধর্ম ধারণা করে অন্যান্য ধর্মগুলি মন্দ বা ত্রুটিপূর্ণ মনে করেন?

উত্তরঃ না; বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কে জ্ঞানী কোনো বৌদ্ধ কখনও তা মনে করেন না। বৌদ্ধদর্শনে সবার প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ চেতনায় এইরূপ সংকীর্ণ চিন্তার অবকাশ নেই। বৌদ্ধিক চিন্তাধারা অনুসারে অন্য ধর্ম সম্বন্ধে মন্তব্য করার আগেই অনুসন্ধান করা উচিত নিজ ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের মিল কোথায়। ধর্মের নৈতিকতা ভালোবাসা, ধৈর্য্য, ত্যাগ ও সামাজিক দায়িত্ববোধ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম, ভাষায়, প্রতীক চিহ্নে ধারণ করেছে। সংকীর্ণ জাত্যভিমান, উগ্র ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অসহনশীল অহমিকা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করে। প্রসঙ্গটি প্রতীকরুপে এভাবে কল্পনা করা যেতে পারেঃ- একজন ইংরেজ, একজন ফরাসী, একজন ইন্দোনেশীয়, একজন চৈনিক, প্রত্যকের দৃষ্টি একটি কাপের দিকে। ইংরেজ বলেছেন এটি কাপ, ফরাসী বলছেন না এটি একটি"টেসী টত্বের"। চাইনীজ বলেছেন আপনারা উভয়ে ভুল বলেছেন, এটি হলো

একটি "পীই", ইন্দোনেশীয় হেসে বললেন- আপনারা সবাই কী বোকা! এটি হলো "কত্তয়ান্"। প্রত্যেকে তাঁদের ভাষার অভিধান হাজির করে নিজ নিজ বক্তব্যের সারবক্তা প্রমাণ করলেন; কিন্তু কেউ অন্যের অভিধান গ্রহণ করতে রাজী নন। প্রত্যেকে যখন এভাবে নিজ নিজ ভাষায় মৌলিকত্ব, এবং ভাষাভাষী জনসংখ্যার আধিক্যের ঐতিহ্য নিয়ে তর্ক-বিতর্কে উত্তেজিত, তখন একজন বৌদ্ধ এসে ঐ কাপে জলপান করে বললেন, এটিকে আপনারা যে নামেই জানুন না কেন এর ব্যবহার হলো, এর সাহায্যে জল পান করা। আসুন, এর সাহায্যে জলপানে সবাই তৃঞ্চা ও ক্লান্তি নিবারণ করি এবং আনন্দ লাভ করি। এই হলো অন্য ধর্মের প্রতি একজন বৌদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গি। এই উপমা থেকে বৌদ্ধ দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

প্রশ্নঃ- বৌদ্ধ দর্শন কি বিজ্ঞান ভিত্তিক?

উত্তরঃ এ প্রশ্ন জবাব দেয়ার আগে বিজ্ঞান বলতে কি বুঝায় তা আলোচনা করা প্রয়োজন। আভিধানিক সংজ্ঞানুযায়ী বিজ্ঞান হলো বিশেষ জ্ঞান পদ্ধতি, যেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতায় প্রাকৃতিক যাবতীয় প্রক্রিয়া প্রমাণ করা হয়। বস্ততঃ প্রকৃতি জগতের সকল প্রক্রিয়া প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে প্রমাণযোগ্য। বৌদ্ধ দর্শনে ব্যাখ্যাত বিষয়গুলো অনুরূপ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াতেই প্রমাণিত সত্য। বৌদ্ধদর্শনের মূল "চতুরার্যসত্য" বুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা লব্ধ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় উদ্ঘাটিত হয়েছে। চতুরার্যসত্যের প্রথম সত্য দুঃখবোধ, প্রিয়বিয়োগ, অপ্রিয় সংযোগ এবং ইপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি জনিত কারণে সৃষ্টি হয়। অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সাহায্যে দুঃখ শনাক্ত, অনুভব ও পরিমাপ করা যায়। দ্বিতীয় সত্যটি, বিজ্ঞানের কার্যকরণ তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবজগতে কোন ঘটনা তার সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া ঘটতে পারে না। তাই দুঃখেরও সুনির্দিষ্ট কারণ থাকে। দুঃখের এই কারণটি হলো লাগামহীন চাহিদা। বিষয়টি অভিজ্ঞতায় সনাক্ত ও পরিমাপ করা যায়। বিজ্ঞানের কোন শাখার পরীক্ষাগারে পরীক্ষার সাহায্যে এই দুটি সত্যের যথার্থতা বুঝানোর জন্য

প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। তৃতীয় সত্যটি হল , এই উৎপন্ন দুঃখ নিরোধ করা যায়, দুঃখের সুনির্দিষ্ট হেতু নিরোধে। অর্থাৎ দুঃখের সুনির্দিষ্ট হেতু, অনিয়ন্ত্রিত চাহিদা রোধ করেই দুঃখ নিরোধ করা সম্ভব। কোন দ্বিতীয় অদৃশ্য শক্তির এখানে ভূমিকা নেই। আপন আচরণের আত্মশক্তির সাহায্যে এ কাজটি সম্পন্ন করতে হয়। কোনও শক্তির কাছে প্রার্থনা বা পূজা করে ফল প্রাপ্তির আশা করা অবাস্তব। এই সত্যটি স্ব-প্রমাণিত ও স্ব-ব্যাখ্যাত। চতুরার্যসত্যের চতুর্থ সত্যটি হল, দুঃখ নিরোধের উপায়। এর যথার্থতা প্রমাণের জন্যেও পদার্থ বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজন নেই। দুঃখের মূল কারণ হলো অনিয়ন্ত্রিত চাহিদা, যার নাম তৃষ্ণা। এই অনিয়ন্ত্রিত চাহিদা রোধের উপায় হলো, ৮টি জীবনাচরণের কর্মপন্থা(আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ)। বিজ্ঞানের মতো বৌদ্ধদর্শনে অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব নেই। প্রকৃতিজগতে প্রাকৃতিক কার্যকারণ, প্রতীত্যসমুৎপাদ প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়। বিশ্বমন্ডলের সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পর্কেও বৌদ্ধদর্শন ও বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য প্রক্রিয়া অভিন্ন, যেখানে কোন অলৌকিক সত্ত্বার অস্তিত্ব নেই। বুদ্ধ বার বার উদাত্ত কণ্ঠে সাবধান করেছেন। তাড়াহুড়ো না করে, অনুসন্ধানের সাহায্যে যেন সকল বিষয় বিচার করে নেয়া হয়; অন্ধবিশ্বাসে যেন কোন বিষয় সত্য বলে গ্রহণ করা না হয়। প্রাকৃতিক জগতে কিছু বিষয় আছে, বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে বস্তুধর্মী পরীক্ষায় যা প্রমাণ করা যায়। মনোজগতের সকল বিষয় অনুরূপ পরীক্ষার প্রমাণ সাপেক্ষ নয়। বিশেষ বিশেষ বিষয় সমূহ বিশেষ অভিজ্ঞতায় স্ব-প্রমাণিত হয়ে স্বতঃসিদ্ধ হয়। দাহ্য বস্তুর সঙ্গে আগুনের সংযোগ ঘটলে আগুন জ্বলে আবার জ্বলন্ত আগুনে জল সংযোগ করা হলে আগুন নির্বাপিত হয়। বিষয়গুলি প্রমাণের জন্যে বিজ্ঞান গবেষনাগারে সরাসরি পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না; অভিজ্ঞতার নিরিখে গ্রহণযোগ্য। বৌদ্ধদর্শনে ব্যখ্যাত দর্শন অনুরূপভাবে বুদ্ধের গভীর মননশীল ধ্যানের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। বিজ্ঞানের কোন শাখায় পরীক্ষার সাহায্যে বিষয়টি প্রমাণ সাপেক্ষ নয়। বুদ্ধ বলেছেন, "প্রচলিত প্রথা, জনশ্রুতি, পবিত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ, বিতর্কের ধাঁধায় প্রমাণিত হয়েছে বলে, ভাবাবেগ বশতঃ কোন বিষয় গ্রহণ করো

না; বরং যা অকুশল, ফলদায়ী নয়, যা জ্ঞানী ব্যক্তি কর্তৃক প্রসংশিত হয়েছে এবং যা অনুশীলনে প্রকৃত সুখশান্তি লাভ হয়, তা-ই অনুসরণ করো।"(অঙ্গুত্তর নিকায় ১ম খন্ড পৃঃ১৮৮) এই পর্যালোচনা থেকে বোঝা যায়, বৌদ্ধ দর্শন কোনো বস্তুবাদী বিজ্ঞানের শাখার গোত্রীভুক্ত না হলেও এই জীবন দর্শন বুদ্ধের ব্যক্তিগত সাধনা ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়ায় প্রমাণিত। এই প্রসঙ্গে এই যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের অভিমত উল্লেখ্য। তিনি বলেছেন, "ভবিষ্যতে ধর্ম হবে বিশ্বমন্ডলীয় কসমিক্ শক্তি ভিত্তিক। এখানে কোন অলৌকিক সত্ত্বা কিংবা তাত্ত্বিক কল্প-কাহিনী থাকবে না। প্রাকৃতিক বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদের অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে এটি হবে অভিন্ন জীবনদর্শন। বৌদ্ধদর্শন মূলতঃ অনূরূপ চিন্তাধারার জীবন দর্শন। বর্তমান বিজ্ঞান চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন ধর্ম যদি থেকে থাকে তা হলো বৌদ্ধধর্ম।" সাম্প্রতিক যুগ সংকটে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কে এই মূল্যায়ন প্রণিধানযোগ্য। মন সকল চিন্তাভাবনায় অগ্রগামী ও প্রধান; মনই সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। গরু চালিত গাড়ির চাকা যেমন গরুর পদচতুষ্টয়কে অনুসরণ করে চলে, অনুরূপভাবে যে কোনো কর্ম, বাক্য চিন্তা সম্পাদনকারীকে ঐ চাকার মতো অনুসরণ করে কর্মফল প্রদান করে।

....
....

বৌদ্ধ দশর্নের নির্যাস

প্রশ্নঃ- বৌদ্ধ দর্শনের মূল বক্তব্য কি?

উত্তরঃ বৌদ্ধদর্শনের মূল বক্তব্য "চতুরার্য সত্যে" বিধৃত। একটি চাকার চারপাশের বেড থেকে যেমন তার বাহুগুলি চাকার কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হয়, তেমনি বৌদ্ধদর্শনের সকল বিষয়ের মূল বক্তব্য "চতুরার্য সত্যে" কেন্দ্রীভূত। শব্দটির 'চতু' আর্যসত্যের চার; 'আর্য' পরিশীলিত জ্ঞান, আর 'সত্য' হলো জীবনমূখী বাস্তবতা। যিনি "চতুরার্যসত্য" হৃদয়ঙ্গম করেছেন,

তিনি জীবন জগতের স্বরূপ প্রণিধান করে জ্ঞানের মহিমায় মহিমান্বিত হয়েছেন।

প্রশ্নঃ- চতুরার্য সত্যের প্রথম সত্য কি?

উত্তরঃ- প্রথম আর্য সত্য হলো সারা জীবন দুঃখ ভোগ করে যেতে হয়। অর্থাৎ বেঁচে থাকতে হলে দুঃখ ভোগ না করে উপায় নেই; কোন না কোন রকম দুঃখ ছাড়া বেঁছে থাকা সম্ভব নয়। আমাদের সবাইকে অসুস্থতা, শারিরীক আঘাত, ক্লান্তি, বার্ধক্য-যন্ত্রণা, একাকীত্ব, হতাশা, ভীতি, অস্বস্থি, অসন্তোষ, ক্রোধের মত মানসিক ক্লেশ এবং অবশেষে মৃত্যুযন্ত্রণার দুঃখ ভোগ করে যেতে হয়। জীবনজগতে প্রিয়বিয়োগ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ এড়ানো সম্ভব নয়।

প্রশ্নঃ- বৌদ্ধদর্শনের মূল বক্তব্য কি হতাশাবাদী নয়?

উত্তরঃ- হতাশাবাদের আভিধানিক অর্থ হলো- যাই ঘটে, সবই মন্দ, ভাল কিছুই ঘটে না, মন্দ ব্যক্তি ভাল ব্যক্তি অপেক্ষা শক্তিশালী ইত্যাদি। এর কোনটিতে বৌদ্ধদর্শন বিশ্বাসী নয়। তাছাড়া সুখশান্তি নেই, এই কথায়ও বৌদ্ধদর্শন বিশ্বাসী নয়। বৌদ্ধদর্শনের বক্তব্য হলো, বেঁচে থাকতে হলে জীবনে অপরিহার্য দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে যেতে হবে যা কারও অস্বীকার করার উপায় নেই। অলৌকিক পৌরনিক কল্পকাহিনীর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধর্মের যে মূলবক্তব্য, তা বাস্তব অভিজ্ঞতার যুক্তি দিয়ে মেনে নেয়া দুষ্কর। বৌদ্ধদর্শনের মূলবক্তব্য বাস্তব অভিজ্ঞতা লব্ধ। বাস্তব সত্য এই যে, আমরা সবাই জাগতিক দুঃখ যন্ত্রণা ভোগকরি যা হতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আমরা অহরহ সংগ্রাম করে যাচ্ছি। বৌদ্ধদর্শনে মানুষের সেই সার্বজনীন চিরন্তন ও দুঃখমুক্তির কথা বলা হয়েছে। এই কারণেই বৌদ্ধধর্মকে সার্বজনীন ও বিশ্বধর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। নিজের মধ্যে সুপ্ত আত্মশক্তিকে জাগ্রত করে জ্ঞানের আলোকে দুঃখ মুক্ত হয়ে নিজেকে সার্বজনীন মঙ্গল কাজে লিপ্ত হতে বৌদ্ধদর্শন শিক্ষা দেয়। বৌদ্ধিক জীবনাদর্শনে হতাশা নেই।

প্রশ্নঃ-দ্বিতীয় আর্যসত্য কি?

উত্তরঃ- দ্বিতীয় আর্যসত্য হলো- "অনিয়মতান্ত্রিক লাগামহীন চাহীদা দুখের সৃষ্টি করে। আমাদের মানসিক যন্ত্রণার বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না , কিভাবে দুঃখের সৃষ্টি হয়। যখন আমরা কিছু পেতে চাই, পাইনা, তখন হতাশাগ্রস্ত হই। কোন প্রিয়ব্যক্তিকে আমাদের আশানুরূপ বয়স পর্যন্ত বাচিয়েঁ রাখতে চাই, কিন্তু পারি না, তখন আবার উৎকণ্ঠায় ভেঙ্গে পড়ি। আমরা চাই , অন্যেরা আমাদের সম্মান করুক, পছন্দ করুক, যখন তা হয় না তখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। তাছাড়া যা চাই তা পেলেও সম্পূর্ণ সুখী হওয়া যায়না। কারণ কিছুদিন পর প্রাপ্ত বস্তুর প্রতি আগ্রহ হ্রাস পায়। এরপর অন্য কিছু পেতে ইচ্ছে জাগে। দ্বিতীয় সত্যের আলোকে বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে বুঝা যাবে, নিয়ন্ত্রণহীন, লাগামহীন চাহিদা আমাদের প্রকৃত সুখশান্তি দিতে পারে না। অবিরাম আরও চাই, এর চাহিদা মেটে না। প্রয়োজন মেটানোর সন্তুষ্টি সীমাবদ্ধ রাখার মধ্যেই প্রকৃত শান্তি নিহিত।

প্রশ্নঃ-অনিয়ন্ত্রিত চাহিদা ও অভাববোধ কি ভাবে শারিরীক যন্ত্রণার কারণ হতে পারে?

উত্তরঃ- সারাজীবন ব্যাপী এটি, সেটি না পাওয়ায় অনিয়ন্ত্রিত তৃষ্ণাবোধ, বৈষয়িক সুখ বিলাস নিয়ে অব্যাহত বেঁচে থাকার কামনার ফলে ব্যক্তি সত্ত্বার মধ্যে এমন ভব উপাদান শক্তি উদ্ভূত হয়, যার প্রভাবে পুনর্জন্ম হয়। এভাবে পুনর্বার দেহধারণের ফলে পুনরায় অপরিহার্য শারিরীক আঘাত, ক্লান্তি, রোগযন্ত্রণা এবং মৃত্যুর শিকারে পরিণত হবার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়।

প্রশ্নঃ- সকল প্রকারের চাওয়া পাওয়ার ইচ্ছা বন্ধ করে দিলে তো আমরা কিছুই অর্জন করতে পারব না, তাই নয় কি?

উত্তরঃ এর উত্তরে বুদ্ধ বলেছেন, তার সারমর্ম হলো, যেহেতু আমাদের অনিয়ন্ত্রিত চাহিদা না পাওয়ার অসন্তোষ আমাদের কষ্ট দেয় সেহেতু

একে রোধ করা উচিত। তিনি আমাদের চাহিদা এবং প্রয়োজনের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করতে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, আমাদের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব; কিন্তু চাহিদা পূরণ করা অসম্ভব। কারণ চাহিদা তলা বিহীন পাত্রের মতো কখনো পূর্ণ হবার নয়। আমাদের সংসারে কিছু কিছু মৌলিক অপরিহার্য প্রয়োজন আছে; তার জন্য অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু এর বাইরে যেটি কখনো তৃপ্ত না হবার চাহিদা, তার নিয়ন্ত্রণ অবশ্য করনীয়। প্রকৃতপক্ষে জীবনের উদ্দেশ্য শুধু চাহিদা মেটানোর জন্যে অবিরাম ছুটতে থাকা নয়। জীবনের উদ্দেশ্য প্রকৃত সুখ শান্তি প্রাপ্তির অনুশীলন করা। মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি মানুষের কল্যাণধর্মী শিল্প, সাহিত্য বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র নির্মাণ করা।

প্রশ্নঃ- আপনি এর আগে পুনর্জন্মের কথা উল্লেখ করেছেন, পুনর্জন্মের কোনও প্রমাণ আছে কি?

উত্তরঃ পুনর্জন্ম হয়, এ সম্পর্কে প্রচুর প্রমাণ আছে। আমরা পরবর্তী পর্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করবো।

প্রশ্নঃ তৃতীয় আর্যসত্য কি?

উত্তরঃ তৃতীয় আর্যসত্য হলো, "দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়ে প্রকৃত সুখশান্তি লাভ করা যায়"। চতুরার্য সত্যে এটিই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এখানে বুদ্ধ আমাদের সুখশান্তি পাওয়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছেন। আমরা যখন অর্থহীন লাগামহীন চাহিদা বর্জন করি, সংসারের অপরিহার্য বাস্তবতাকে ধৈর্য ও অধ্যাবসায়ে ও ক্রোধহীন হয়ে সমাধান করে অন্যের প্রতি ঘৃণাবোধ রোধ করি, বর্তমানের প্রতিদিনটিতে অভিজ্ঞতা লব্ধ আনন্দে বাঁচার সন্তুষ্টি নিয়ে বাঁচতে শিখি, এইভাবে মৃত অতীতের জন্য অনুশোচনা না করে, বরং অতীতের কৃত ভূল থেকে শিক্ষা লাভ করে, অনাগত ভবিষ্যত সম্পর্কে দুঃচিন্তা না করে, সম্পূর্ণভাবে বর্তমানের প্রতি মুহুর্তের মধ্যে বাঁচার অনুশীলন করে বর্তমানকে কুশল করে, ভবিষ্যতকে মনোরম করে গড়া যায়। আমরা এভাবে দুঃখকে অতিক্রম করে প্রকৃত

সুখশান্তি লাভ করতে পারি। এই অবস্থায় আমরা নিজের গন্ডিবদ্ধ সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা মুক্ত হয়ে অন্যকে সাহায্য করার সহমর্মিতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারি। এ অবস্থার ক্রম-অগ্রগতির ফলে মানসিক সকল প্রকার যন্ত্রণার উপশম হয় এবং নির্বাণের পথ সুগম হয়।

প্রশ্নঃ- নির্বাণ কি? এর অবস্থান কোথায়?

উত্তরঃ নির্বাণ স্থান-কাল-মাত্রা উত্তীর্ণ এক অবস্থা। স্থান-কাল-মাত্রা সীমিত কোন বিষয় বর্ণণা করা যেতে পারে, কিন্তু স্থান-কাল-মাত্রা উত্তীর্ণ বিষয়ের বর্ণণা করা সম্ভব নয়। এর ব্যখ্যার, নির্বাণে উত্তীর্ণ নয়, এমন কারও পক্ষে বর্ণনা ও উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। নির্বাণ অনন্ত যার কোন পরিসীমা নেই, আত্ম-অনাত্ম নেই। বুদ্ধ বলেছেন, নির্বাণ নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ অনুভূতির বিষয়, বর্ণনায় এর যথার্থতা বুঝানো সম্ভব নয়। গুড়, চিনি, মধু কোনটির মিষ্টি কিরূপ, তা যেমন স্বাদ গ্রহণ করে অনুভব করতে হয়, নির্বাণ বিষয়টিও অনুরূপ। বুদ্ধ বলেছেন, নির্বাণ হলো এক অপরিমেয় সুখানুভূতি। এখানে জন্ম-মৃত্যু ও দুঃখের যন্ত্রণা নেই, তথা প্রচলিত সুখের বিহ্বলতাও নেই। এটি সুখ-দুঃখ উত্তীর্ণ, নির্বাণ প্রশান্ত অবস্থা।

প্রশ্নঃ- নির্বান এক মাত্রা উত্তীর্ণ অবস্থা, তার কি কোন প্রমাণ আছে?

উত্তরঃ না তার কোন প্রমাণ নেই বটে; কিন্তু এ সম্পর্কে মন্তব্য করা যায়। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় মাত্রাসীমিত সময় ও স্থানের অস্তিত্ব থাকাতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, মাত্রা উত্তীর্ণ সময় ও স্থানের অস্থিত্ব আছে। এই অবস্থাকে নির্বাণ আখ্যায়িত করা হয়। নিজ অভিজ্ঞতায় নিজের জিহ্বার সাহায্যে আস্বাদিত মিষ্টির স্বাদ যেমন বর্ণনা করা সম্ভব নয়, নির্বাণের সুখ অনুভূতি ও অস্তিত্ব সম্পর্কে তেমনি সরাসরি প্রমাণ উপস্থাপন করা সম্ভব না হলেও নির্বাণের অস্তিত্ব সম্পর্কে বুদ্ধের নিজ অভিজ্ঞতার কথা আছেঃ

"যেখানে না-সৃষ্টি, না-জন্ম, না-বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং না-যুক্ত হওয়া প্রক্রিয়া অনুপস্থিত, সেখানে সৃষ্টি হওয়া, জন্ম হওয়া, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া, যুক্ত হওয়া

সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে যেখানে সৃষ্টি, জন্ম, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও যুক্ত হবার প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব বিদ্যমান, সেখানে সৃষ্টি, জন্ম, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও যুক্ত হবার প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব বিদ্যমান বলে সিদ্ধান্ত নেয়া বিজ্ঞান সম্মত"। নির্বাণের অস্তিত্ব সম্পর্কে উপরোক্ত ব্যাখ্যায় দেখি, প্রকৃতপক্ষে নির্বাণ স্তরে উন্নিত হলেই নির্বাণ সম্বন্ধে জানা সম্ভব হয়। তার আগে আমাদের ঐ অনাবিল, অপ্রমেয় শান্তি স্তরে নিজেদের উন্নিত করার অনুশীলনে মগ্ন হওয়া কর্তব্য।

প্রশ্নঃ- চতুরার্য সত্যের চতুর্থ আর্যসত্য কি?

উত্তরঃ চতুর্থ সত্যে দুঃখ দূর করার উপায় উল্লেখ আছে। এই উপায়কে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলা হয়। এই আট অঙ্গ হলোঃ

১) সম্যকভাবে বুঝা বা হৃদয়াঙ্গম করা। সম্যকদৃষ্টিতে যা যেমন তাকে তেমনভাবে প্রত্যক্ষ করা।

২) সম্যক কর্ম হল, সঠিক ভাবে কর্ম সম্পাদন করার সঙ্কল্প গ্রহণ করা।

৩) সম্যক বাক্য হল যা নিজের ও অন্যর জন্য ক্ষতিকর নয়, এমন বাক্যালাপ।

৪) নিজের এবং অন্যের জন্য কুশলধর্মী কর্ম সম্পাদন করা।

৫) সম্যকভাবে জীবীকা অর্জন করা(মাদক দব্য, বিষ, মাছ-মাংস, মারণাস্ত্র, দেহব্যাবসা ইত্যাদি অসম্যক জীবীকা)।

৬) সম্যক চেষ্টা করা।

৭) সম্যক স্মৃতি হল, যখন যা করা হয় তখন তাতে সচেতন মনোযোগ রাখা।

৮) সম্যক সমাধি হল, জীবনাচরণে মনের একাগ্রতা।

বৌদ্ধ জীবনাচরণে এই আটটি জীবনাচরণ সম্পূর্ণতা লাভ না করা পর্যন্ত সাধনা ও প্রয়াস অব্যহত রাখা। বিশ্লেষণও বিচার করলে লক্ষ্য করা যায়, আর্যঅষ্টাঙ্গীক মার্গের ৮টি জীবনাচরণের মধ্যে জীবনের প্রয়োজনীয় প্রত্যক বিষয়, বুদ্ধিবৃত্তি, মেধা, নৈতিকতা, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, মনস্ত্ব- এক কথায় একজন মানুষের পার্থিব জীবন থেকে আধ্যাত্ম জীবনে উন্নয়নের সকল বিধি বিধৃত আছে।

....

....

বৌদ্ধদর্শনে ঈশ্বর

প্রশ্নঃ- বৌদ্ধরা কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?

উত্তরঃ না, বৌদ্ধেরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। এর স্বপক্ষে কয়েকটি যুক্তি আছে। আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের মতো বুদ্ধ বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বরে বিশ্বাসের বিষয়টি মানুষের মনের ভয়-ভীতি থেকে সৃষ্ট। বুদ্ধ বলেছেন, ভয়াথ র্মানুষ তথাকথিত পবিত্র পাহাড়-পবর্তে, গুহায়, পবিত্র বৃক্ষের তলায় কিংবা দেব-দেবীর স্মৃতি মন্দিরে নিয়মিত যাতায়াত করে থাকেন। আদিম অধিবাসী মানুষকে ভয়াবহ বিপদজনক প্রতিকূল পরিবেশে বসবাস করতে হতো। চারপাশে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ভয়, ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য পযার্প্ত খাদ্যের অভাব, শারিরীক আঘাত ও রোগের যন্ত্রণা, বিদ্যুৎ চমকানো বজ্রাঘাত এবং আগ্নেয়গিরির ভয় সংকুল পরিবেশে মানুষ নিজেকে অসহায় বোধ করতো। কোথাও নিরাপত্তা খুঁজে না পেয়ে ভয়ার্থ মানুষ নিরাপত্তার আশ্রয় হিসেবে ঈশ্বর কল্পনা করেন। ঈশ্বরের কাছে বিপদের সময় সাহস, দুঃসময়ে সান্তনা এবং সুসময়ে স্বস্তি লাভ করেন। আপনি লক্ষ্য করবেন বিপদে পড়লে মানুষ বেশী ধার্মীক হয়ে উঠেন। বিপদ সংকট উত্তরণের জন্য দেব-দেবী বা কোন অদৃশ্য শক্তির কাছে প্রার্থনা করা হয়, যাতে সেই শক্তি বিপদমুক্ত করেন। এতে বিপদগ্রস্ত মানুষের মনে সাহসের সঞ্চার হয়। যাঁরা যেই দেব-দেবীতে বিশ্বাসী, তাঁদের

প্রার্থনা অভিষ্ট সেই দেব-দেবী শোনেন এবং সাড়া দেন বলে বিশ্বাস করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, অজ্ঞতা জনিত ভয়ের কারণে ঐরূপ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়। ভয়ের কারণ বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তির সাহায্যে বিশ্লেষণ করতে, হতাশার কারণ অনিয়ন্ত্রিত ভোগতৃষ্ণা প্রশমিত করতে এবং অপ্রতিরোধ্য বিষয়গুলোকে শান্ত, ধৈর্যশীল ও সাহসী হয়ে মোকাবিলা করার জন্য বুদ্ধের উপদেশ প্রণিধানযোগ্য।

ঈশ্বরে বিশ্বাস না করার দ্বিতীয় কারণ হলো ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অভাব। ঈশ্বরে বিশ্বাসী ধর্মগ্রন্থ সমূহে ঈশ্বর বিশ্বাস সম্পর্কে নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে উদ্ধৃত বিষয়সমূহ সঠিক, অন্যদের সঠিক নয় বলে দাবি করা হয়। কেউ ঈশ্বরকে পুরুষ, কেউ ঈশ্বরকে নারী, আবার কেউ ক্লিব হিসেবে বিশ্বাস করেন। প্রত্যেকের নিজ নিজ বিশ্বাস সত্য, অন্যদের বিশ্বাস মিথ্যা বলে দাবি ও উপহাস করেন। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এই যে, বিগত শত শত বছর ধরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে তর্ক বিতর্কের উর্ধ্বে, সুনিশ্চিত ও বিজ্ঞানসম্মত কোনও সাক্ষ্য প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। সেই কারণে, সুনির্দিষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত, বৌদ্ধরা বিষয়টি মুলতবি রেখে দিতে চান।

ঈশ্বরে বিশ্বাস না করার তৃতীয় কারণ হলো, শুদ্ধ সার্থক জীবন যাপনে ঈশ্বরে বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই। অনেকে মনে করতে পারেন, বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্টির রহস্য উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের প্রয়োজন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান এইরূপ কোন বিশ্বাস ছাড়াই সৃষ্টি রহস্য উদ্ঘাটন করেছে। আবার কেউ মনে করেন, সুখী ও উৎকণ্ঠাহীন জীবন যাপনে ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রয়োজন। এ কথাও ঠিক বলে মনে হয় না। শুধুমাত্র বৌদ্ধরা নন্, পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ আছেন, যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন্। তাঁরা অন্যান্যদের মত কার্যকারণের নিয়মে কর্মফল ভোগ করে জীবনযাপন করে যাচ্ছেন। আবার অনেকে মনে করেন, নিজের মধ্যে শক্তি সঞ্চারের জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রয়োজন। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন্, এমন অনেকে আছেন, যাঁরা আত্মবিশ্বাস ও নিজেদের কর্মোদ্যমে বাঁধা-বিপত্তি ও পঙ্গুত্বের অক্ষমতা অতিক্রম করে সফলতার চুড়াঁয় আরোহণ

করেছেন। আবার কেউ মনে করেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস আত্মমুক্তির সহায়ক। বুদ্ধ নিজের সাধনলব্ধ বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, প্রতিটি মানুষ মনের কলুষ দূর করে, মৈত্রী করুণার আদর্শ জীবনযাপনে প্রজ্ঞা অর্জন করতে পারেন এবং আপন প্রজ্ঞা শক্তিতে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম। বুদ্ধ মানুষের দৃষ্টিকে অলৌকিক ঈশ্বর কেন্দ্রিকতা থেকে মানবকেন্দ্রিকতায় ফিরিয়ে এসেছেন এবং আত্মশক্তি দিয়ে নিজ সমস্যা সমাধানে মানুষকে উজ্জিবীত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে অলৌকিক কল্পনাশ্রিত শক্তি অপেক্ষা অভিজ্ঞচালক আত্মশক্তি অনেক বেশী শক্তিশালী। প্রাকৃতিক কার্যকারণে, নিজ নিজ শুদ্ধ-অশুদ্ধ জীবনাচরণগত কর্মই প্রত্যক মানুষের শুভ-অশুভ কর্মফল প্রদান করে। দ্বিতীয় অদৃশ্য কোন শক্তির এখানে ভূমিকা নেই।

['অর্থব, উদ্যমহীন অশ্বকে পেছনে ফেলে সক্রিয় উদ্যোগী বেগবান অশ্ব যেমন এগিয়ে চলে, জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবানরা তেমনি নিষ্ক্রয়দের মধ্যে সক্রিয়, সুপ্তদের মধ্যে জাগ্রত এবং ক্রোধীদের মধ্যে অক্রোধী হয়ে প্রগতির দিকে এগিয়ে চলে।']

প্রশ্নঃ- যদি সৃষ্টিকর্তা না থাকে তাহলে বিশ্বমন্ডল হলো কি করে?

উত্তরঃ ঈশ্বরে বিশ্বাসী সব ধর্মই কাল্পনিক ও পৌরনিক কাহিনীর সাহায্যে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করছে। একবিংশ শতাব্দীতে পদার্থ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞানের তথ্যের কাছে পৌরনিক কল্পকাহিনী এখন গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমানে ঈশ্বরে বিশ্বাস ছাড়াই সৃষ্টি রহস্য উদ্ঘাটন করা হয়েছে, যা বৈজ্ঞানিক তথ্যে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রশ্নঃ-বিশ্ব মন্ডলের সৃষ্টি সম্পর্কে বুদ্ধ কি বলেছেন?

উত্তরঃ এ সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞান এবং বুদ্ধের ব্যাখ্যা অভিন্ন। "অগ্গঞ্ঞা সূত্রে" বুদ্ধের ব্যাখ্যা হলো, লক্ষ লক্ষ বছরের দীর্ঘ সময় ব্যাপী প্রাকৃতিক বিবর্তনের ধারায় সৌরমন্ডল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে পুনরায় সৌরমন্ডলের বর্তমান ঘূর্ণায়মান অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতির প্রথম প্রাণীর সৃষ্টি হয় জলে, এককোষী প্রাণী হিসেবে। পরবর্তী পর্যায়ে বিবর্তনের মাধ্যমে এককোষী

প্রাণী বহুকোষী যৌগিক প্রাণীতে রূপান্তরীত হয়। প্রাকৃতিক কার্য-কারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই রূপান্তর ঘটেছে, যা বুদ্ধের "প্রতীত্য সমুৎপাদ সূত্রে"ও দেশিত হয়েছে।

প্রশ্নঃ-আপনি বলছেন, সৃষ্টির রহস্য ঈশ্বরে বিশ্বাস ছাড়া প্রমাণিত হয়েছে। তাহলে অলৌকিক ঘটনাগুলো কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

উত্তরঃ অনেকে বিশ্বাস করেন, অলৌকিক ঘটনাগুলো ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ। কিন্তু অলৌকিক উপায়ে কোন রোগ নিরাময় হতে পারে চিকিৎসা বিজ্ঞানে সমর্থন পাওয়া যায় না। জনশ্রুতিতে শোনা যায়, কেউ বিপর্যয় থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছেন। কিন্তু কি প্রক্রিয়ায় তা ঘটেছে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। রোগাক্রান্ত বেঁকে যাওয়া শরীর সোজা হয়ে গেছে, পক্ষাঘাতে অবশ প্রত্যঙ্গ শক্তি ফিরে পেয়েছে ইত্যাদি ঘটনা অলৌকিকভাবে ঘটেছে বলে দাবী করা হলেও চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরীক্ষায় তার সত্যতা প্রমাণ করে না। জনশ্রুতি, অসমর্থিত দাবী কখনো প্রমাণিত সত্যের বিকল্প হতে পারেনা। ব্যাখ্যা করা যায় না কিংবা প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলে না এমন ঘটনা কখনো কখনো ঘটে থাকে। এর ব্যখ্যা করার ক্ষমতা আমাদের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা প্রমাণ করে, কিন্তু তাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির আগে রোগে আক্রান্ত হওয়াকে কোন দেবদেবী বা ঈশ্বরের শাস্তি বলে বিশ্বাস করা হতো। এখন রোগের কারণ জানা গেছে, রোগাক্রান্ত হলে চিকিৎসা করে রোগ নিরাময় হয়। ভবিষ্যতে আমাদের জ্ঞান পরিধি আরও বিস্তৃত হলে আজকের অজানা অনেক রহস্য উম্মোচিত হবে, যেমন এখন আমরা অনেক রোগের কারণ বুঝতে সক্ষম হয়েছি।

প্রশ্নঃ- অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোনো না কোনোভাবে বিশ্বাস করেন। এখানে সত্য নিহিত আছে, এই কথা কি বলা যায় না?

উত্তরঃ না, তা বলা যায় না। এক সময় ভূ-মন্ডলকে চ্যাপ্টা বলে মনে করা হতো। কিন্তু পরে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। বিপুল সংখ্যক মানুষ কিছু

বিশ্বাস করে বলে, তা সত্য- এ কথা বলা যায় না। সত্য মিথ্যা নিরূপন করা উচিত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে।

প্রশ্নঃ- বৌদ্ধেরা ঈশ্বরে বিশ্বাস না করলে কিসে বিশ্বাস করেন?

উত্তরঃ আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। আমরা মানুষের অপরিমেয় শক্তিতে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি, প্রত্যেক মানুষ মূল্যবান এবং প্রতিটি মানুষের মধ্যে অনন্ত মেধা সুপ্ত আছে। কর্মসাধনায় প্রতিটি মানুষ বুদ্ধের মত প্রজ্ঞা লাভ করে কোন বিষয় আসলে যে রকম ঠিক সেই রকম প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হতে পারেন। আমরা বিশ্বাস করি, মনের ঈর্ষা, ক্রোধ ও ঘৃণার স্থলে করুণা, ক্ষমা ও মৈত্রীর অনুভূতিতে উজ্জিবীত হয়ে প্রতিটি মানুষ নিজ জ্ঞানশক্তির সাহায্যে জীবন জগতের সকল সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম। বুদ্ধ বলেছেন আমাদের অন্য কেউ রক্ষা করতে পারে না, নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে হয়।

অজ্ঞতা দূর করে জ্ঞানের আলোকে জীবনের স্বরূপ জ্ঞাত হয়ে আপন কর্মশক্তির সাহায্যে নিজ নিজ সমস্যা সমাধান করতে হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার জ্ঞানালোকে বুদ্ধ স্পষ্ট ভাবে সেই পথ চলার সন্ধান দিয়েছেন।

প্রশ্নঃ- অন্য ধর্মের অনুসারীরা তাঁদের দেবদেবীর নির্দেশিত উপায়ে কোনটি সত্য কোনটি মিথ্যা তা নির্ধারণ করেন। আপনি তো ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, কি করে নির্ধারণ করেন- কোনটি সত্য কোনটি মিথ্যা?

উত্তরঃ যে চিন্তা-ভাবনা-বাক্য কিংবা কর্ম ঈর্ষা, লোভ, ঘৃণা ও মোহের শেখরে আবদ্ধ, তা মন্দ ও অমঙ্গলদায়ক এবং নির্বাণের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। যে চিন্তা-ভাবনা-বাক্য বা কর্ম; ত্যাগ, ক্ষমা, মৈত্রী, করুণা ও প্রজ্ঞার শেখরে নিবদ্ধ, তা সত্য, মঙ্গল ও উত্তম এবং নির্বাণের পথে নিয়ে যায়। ঈশ্বর নির্ভর ধর্ম দর্শনে আপনাকে যা করতে নির্দেশ দেয়া হয়, তাই করতে হয়। কিন্তু মানবকেন্দ্রিক ও যুক্তি নির্ভর বৌদ্ধ দর্শনে নিজের আত্মশক্তির বিচার বিশ্লেষণে, আত্মোপলদ্ধির সাহায্যে কোনটি সত্য, কোনটি

মিথ্যা, কোনটি ভাল, কোনটি মন্দ কোনটি মঙ্গলজনক, কোনটি অমঙ্গলজনক তা নির্ধারণ করতে পারেন।

জ্ঞান ভিত্তিক নৈতিকতা, আদেশ-নির্দেশ নির্ভর নৈতিকতার চাইতে অবশ্যই অধিকতর শক্তিশালী। কেননা প্রথমটি বিচার বিশ্লেষণের উপর, দ্বিতীয়টি বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল।

অনুরূপভাবে, কোনটি সত্যাশ্রয়ী, কোনটি মিথ্যাশ্রয়ী, কোনটি নিজের এবং অন্যের জন্য মঙ্গলজনক তা নিরূপনের জন্য বুদ্ধ তিনটি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করার জন্য উপদেশ দিয়েছেনঃ

১) যদি উদ্দেশ্য সত্যাশ্রয়ী হয় অর্থাৎ যে কর্ম ভালোবাসা ও প্রজ্ঞা উদ্ভূত,

২) যে কর্মফল নিজের সহায়ক হয় অর্থাৎ কর্ম যদি নিজেকে অধিকতর ত্যাগী, মৈত্রীপূর্ণ ও প্রজ্ঞাবান করতে সক্ষম হয়,

৩) যে কর্ম অন্যের জন্য উপকারী অর্থাৎ যে কর্ম অন্যকে অধিকতর ত্যাগী, মৈত্রীভাবাপন্ন ও প্রজ্ঞাবান করতে সাহায্য করে, সেই কর্ম সম্পাদনই সত্যাশ্রয়ী, উত্তম, নৈতিক এবং সর্বাঙ্গীন মঙ্গলময়। তবে কার্যকারণ প্রক্রিয়ার সুক্ষ্ম বিচারে আপাতদৃষ্টিতে ব্যতিক্রম থাকতে পারে। যেমনঃ সৎ উদ্দেশ্যে কোন কর্ম বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা আমার ও অন্যের মঙ্গলদায়ক মনে না হতে পারে। আবার কখনো কখনো আমার সৎ উদ্দেশ্যে কৃত কর্ম আমার জন্য মঙ্গলদায়ক হলো, কিন্ত অন্যের জন্য কষ্টদায়ক মনে হতে পারে। তবে মিথ্যশ্রয়ী কর্ম সম্পদনের ফল, আমার এবং অন্যের জন্য অবশ্যই কষ্টদায়ক হবে। কুশলধর্মী কর্মের ফল আমার এবং অন্যের জন্য সর্বাঙ্গীন মঙ্গলদায়ক হবে। সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কর্মের ফলপ্রাপ্তি শুধু সময়ের ব্যাপার। বুদ্ধ বিচার বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সত্যাশ্রয়ী ও মিথ্যাশ্রয়ী কর্ম সম্পাদনের এবং কর্মফল প্রাপ্তির ব্যাখ্যা করেছেন। প্রকৃতির নিয়ম রাজ্যে কার্যকারণ প্রক্রিয়ার এমন বিধান কার্যকরী, যার প্রভাবেই যথাযথ কর্মের যথাযথ ফলের সৃষ্টি হয়। এটিই বুদ্ধের দীর্ঘ ৬বছর কঠোর সাধনালব্ধ এবং অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যোৎঘাটন।

. . . .
. . . .

পঞ্চশীল

প্রশ্নঃ- বৌদ্ধ দর্শনে কি জীবনাচরণের কোনও নীতিমালা আছে?

উত্তরঃ অবশ্যই আছে। পঞ্চশীলই বৌদ্ধ জীবনাচরণের নীতিমালা। পঞ্চশীলের প্রথম শীলে কোন জীবহত্যা কিংবা কোনও প্রাণীর শারিরীক ও মানসিক আঘাত করা হতে বিরত থাকতে উপদেশ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় শীলে প্রাপ্য নয়, এমন কোন বস্তু নিজের অধিকারে আনা হতে বিরত থাকার; তৃতীয় শীলে, যে কোন প্রকারের যৌন অনাচার থেকে বিরত থাকার; চতুর্থ শীলে, নিজের ও অন্যের ক্ষতি করতে পারে এমন বাক্যালাপ থেকে বিরত থাকার এবং পঞ্চম শীলে, মদ্যপান কিংবা শারিরীক ও মানসিক ক্ষতি করতে পারে ঐরূপ খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দেয়া হয়েছে।

[অপরের দোষের দিকে, অপরের কৃতকর্ম সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ ভাবে সম্পাদিত হলো কিনা, তার দিকে দৃষ্টি দেয় না। শুধুমাত্র নিজের কর্ম সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হলো কিনা তার দিকে মনোনিবেশ করা, এবং বিচার বিশ্লেষণ করা উচিত।]

প্রশ্নঃ-কিন্তু মাঝে মাঝে প্রাণী হত্যা করা ভালো। যেমনঃ রোগ সংক্রমণকারী কীট অথবা কেউ যদি আপনাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তাহলে তাকে হত্যা করা কি উচিত নয়?

উত্তরঃ কাউকে হত্যা করা আপনার জন্য ভালো হতে পারে, কিন্তু যাকে হত্যা করা হলো তার অবস্থা কল্পনা করুন। আপনার মতো সেই প্রানীটিও বাঁচতে চায়। রোগ সংক্রমণকারী কীট মারার মধ্যে মিশ্রিত কর্মফল বিদ্যমান। এখানে আপনার উপকার সেই প্রাণীর জন্যে অপকারী(মন্দফল) ফল বিদ্যমান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়- চলার পথে জীবন্ত কেঁচোকে রজ্জুখন্ড ভেবে পায়ে মাড়ালে প্রাণী হত্যার অকুশল কর্ম হবে না। পক্ষান্তরে জড় রজ্জুখন্ডকে জীবন্ত কেঁচো ভেবে পায়ে মাড়ালে প্রাণী হত্যার অকুশল কর্ম বলে গণ্য হবে।

কখনো কখনো প্রাণী হত্যার প্রয়োজন হতে পারে বটে তবে তা কখনো সর্বাঙ্গীন ভাল কর্ম নয়। প্রকৃতপক্ষে কায়মনো বাক্যে কৃত সকল কর্মে বুদ্ধ চেতনাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। হত্যার চেয়ে জিঘাংসা মনোবৃত্তি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন রোগ-চিকিৎসায় জীবণু বিনাশী ঔষধ ব্যবহারের সময় জীবাণু বিনাশী জিঘাংসার চেয়ে রোগ নিরাময় চেতনা মুখ্য থাকে।

প্রশ্নঃ- আপনারা বৌদ্ধরা কীট-পতঙ্গ নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেন, তাই নয় কি?

উত্তরঃ বৌদ্ধ দৃষ্টিকোণে ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী করুণা বৌদ্ধিক দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিকে পরস্পর নির্ভরশীল ও একক মনে করা হয়। বিশ্ব প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় প্রত্যেক জড়-জীবের সুনির্দিষ্ট ও প্রয়োজনীয় ভূমিকা আছে। তাই বিশ্ব প্রকৃতির এই ভারসাম্য ছিন্ন করার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, যাদের জীবনাচরণে প্রাকৃতিক সম্পদ শুধু ব্যবহার করে নিশেষ করার প্রবণতা আছে, কিন্তু পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সংরক্ষণের উদ্যোগ নেই, প্রকৃতির প্রতিশোধ মূলক রুদ্ররোষে পড়তে হয় তাদের। ভারসাম্য নষ্ট করার ফলে বায়ুমন্ডল দুষণ, জল বিষাক্ত হয়ে নদ-নদী নিশেষ, মনোমুগ্ধকর পশুপাখীর বিলুপ্তি, পাহাড়-পর্বতের মালভূমি ও কৃষিভূমি ধসে নিষ্ফলা, এমনকি ঋতুচক্রও পরিবর্তন হয়ে যায়। মানুষ যদি কিঞ্চিত সহণশীল হয়ে পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে প্রাণী নিধন, বনসম্পদ উজাড় পাহাড়-পর্বত ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকে এই ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে না।

জীবজগতের প্রতি আমাদের উচিত আরও অধিক মমত্ববোধ গড়ে তোলা। এই বিষয়টি পঞ্চশীলে বিধৃত হয়েছে।

প্রশ্নঃ- পঞ্চশীলের তৃতীয় শীলে যৌন অনাচার থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেয়া হয়েছে। যৌন অনাচার কি?

উত্তরঃ ছল-চাতুরী, ভাবাবেগের কৌশলে কিংবা ভয়-ভীতি প্রদর্শনে যৌনসংগম হলো যৌন অনাচার। বিয়ের সময় স্বামী-স্ত্রী উভয়ে নিজেদের

যৌনাচার সম্পর্কে বিশ্বস্ত থাকার অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। এর লঙ্ঘনে অবিশ্বস্ততার অপরাধে দোষী হিসেবে গণ্য হতে হয়। যৌন মিলন হলো স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা, আন্তরিকতা ও মানসিক ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ। সম্প্রতি এইডস রোগের বিশ্বব্যাপী মারাত্মক প্রকোপ এই শীল ভঙ্গের কর্মফল।

[অস্থির-অশান্ত ও চঞ্চল মনের নিয়ন্ত্রণ সহজ নয়। জ্ঞানী ব্যক্তি তীরন্দাজের তীর দিয়ে লক্ষ্যবস্তু স্থির করার ন্যায় মনকে লক্ষ্যের মধ্যে স্থির রাখেন]

প্রশ্নঃ- বিয়ের আগে যৌন সংগম কি যৌন অনাচার?

উত্তরঃ দু'জনের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও ভালবাসা থাকলে তা যৌন অনাচার রূপে গণ্য হতে পারে না বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক বিধানে যৌন মিলনের উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জৈবিক প্রজনন। অবিবাহিত নারী অন্তঃসত্তা হলে কি ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন অথবা প্রাকৃতিক বিধানে কি শাস্তি পেতে হয়, তা মনে রাখ অবশ্য কর্তব্য।

অভিজ্ঞ বিবেকবান মনিষীদের উপদেশ হলো বিয়ের আগে যৌন সংগম হতে বিরত থাকা মঙ্গলজনক। এইরূপ অসংযত জীবনাচারের ফলে অনেকে যৌন ব্যাধির শিকার হচ্ছেন।

....
....

পুনর্জন্ম

প্রশ্নঃ- মানুষ কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়?

উত্তরঃ এর তিনটি সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে। ঈশ্বরে বিশ্বাসীরা দাবী করেন, জন্মগ্রহণের আগে জীবনের অস্তিত্ব থাকে না, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তার সৃষ্টি হয়। জন্মের পর জীবন যাপন, এবং পরিশেষে মৃত্যুর পর ব্যক্তিসত্বার অনন্ত কালের স্বর্গে কিংবা নরকে গমন হয়। অন্যদিকে বিজ্ঞানীরা দাবী করেন, প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াতে মানুষের জন্ম হয় এবং জীবনকাল অতিবাহিত হবার পর প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মৃত্যুতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। বৌদ্ধেরা ঐ দুটির কোনটিই বিশ্বাস করেন না।

প্রথম ব্যাখ্যায় নীতিগত ত্রুটি এই যে, ঈশ্বর যদি সৃষ্টি করেন, তাহলে কোন কোন মানুষ কেন নানা পঙ্গুত্ব নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেন, কেন কিছু ভ্রূণের গর্ভপাত হয়, কেনইবা মৃত সন্তানের জন্ম হয়। এছাড়া ৬০/৭০ বছরের জীবনব্যাপী কৃতকর্মের শাস্তি কিংবা পুরষ্কার রূপে কেন অনন্তকাল ধরে নরক যন্ত্রণা কিংবা স্বর্গে সুখ ভোগ করতে হয়। এটি যুক্তি সঙ্গত নয়।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি প্রথমটি অপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত মনে হলেও এতে কিছু অমীমাংসীত প্রশ্ন থেকে যায়। মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষের মস্তিষ্কের মত এত জটিল প্রত্যঙ্গ এখনও সৃষ্টি হয়নি। জীবপ্রকৃতির এই মনুষ্য প্রজাতির ডিম্বানু ও শুক্রানুর সমন্বয়ে কিভাবে এত জটিল চিত্ত চেতনা কাযর্ক্রম প্রক্রিয়ার জন্ম হতে পারে?

কি করে আধুনিক বিজ্ঞান শাখার “টেলিপ্যাথি” ও “প্যারাসাইকোলজি” সংক্রান্ত মনের ক্রিয়াকলাপ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এই জটিল প্রশ্ন অমীমাংসীত থেকে যায়। মানুষের পূর্বর্ত জন্ম সম্পর্কে বৌদ্ধ দর্শনের ব্যাখ্যা হলো, জন্ম থেকে মৃত্যু আবার কর্ম অজির্ত ব্যক্তিসত্ত্বার মননশীলতা, প্রবণতা, মুখ্যতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মৃত্যুর পর কায্যকারণ প্রক্রিয়ায় যথোপযুক্ত ডিম্বাণুতে সম্পৃক্ত হয়, যা নিষিক্ত হয়ে পুনজর্ন্ম লাভ করে। নতুন ব্যক্তি সত্ত্বায় পূরব জীবনে অর্জিত মননশীলতা, মা-বাবার জিন্-গত প্রভাব, পারিবারীক, সামাজিক, প্রশিক্ষণ, বর্তমান জীবনের ব্যক্তিসত্ত্বা গঠনে প্রভাব ফেলে। এভাবে জন্ম-মৃত্যুর প্রক্রিয়া চলতে থাকে যতদিন জন্মপ্রবাহের উপাদান ভবতৃঞ্চা বিদ্যমান থাকবে। প্রজ্ঞার আলোকে জীব সত্ত্বার স্বরূপ উপলদ্ধিতে জন্মপ্রবাহের উপাদান ভবতৃঞ্চা বিলুপ্ত হলে মননশীলতার এমন স্তর অজির্ত হতে পারে, যেখানে সত্ত্বার সুখ-দুঃখ-বেদনা একাকার হয়ে নিবার্ণপিত হয়। ফলে পুনজর্ন্ম রুদ্ধ হয়। সুখ-দুঃখ, আশা-হতাশা, যশঃ-অযশঃ, নিন্দা-প্রশংসায় অকম্পিত প্রশান্তিতে বিলীন প্রাপ্ত মানসিক এই অবস্থার নাম নিবার্ণ। নিবার্ণই বৌদ্ধিক ব্যক্তির একমাত্র লক্ষ্য।

প্রশ্নঃ- মনের তো কোন বস্তুসত্ত্বা নেই, কি করে মন এক দেহ থেকে অন্য দেহে স্থানান্তরিত হতে পারে?

উত্তরঃ মানসিক প্রবাহ দেহ থেকে দেহান্তরে যাবার প্রক্রিয়াকে বেতার তরঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বেতার তরঙ্গে কোন শব্দ বা সঙ্গীত-রাগ থাকে না; থাকে শক্তি তরঙ্গ, যা কস্মিক শক্তি হিসেবে প্রবাহিত হয়ে গ্রাহক যন্ত্রে যুক্ত হয়ে শব্দ কিংবা সঙ্গীত হয়ে প্রচারিত হয়। অনুরূপ কার্যকারণ প্রক্রিয়াতে মৃত্যুর পর ব্যক্তি সত্ত্বার মননশক্তি সুনির্দিষ্ট ডিম্বানুতে আকৃষ্ট হয়ে ভ্রূণ বৃদ্ধিলাভ করে। বৃদ্ধিপ্রাপ্তির সময় মস্তিষ্কের সাহায্যে নতুন ব্যক্তি সত্তা সংগঠিত হয়ে জন্মলাভ করে।

প্রশ্নঃ- মৃত্যুর পর কি মানুষ হয়ে সবার জন্ম লাভ হয়?

উত্তরঃ কোন ব্যক্তিসত্তার কোথায় জন্মলাভ হবে, তা কার্যকারণ প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত হয়। কেউ স্বর্গ সুখ, কেউ নরক যন্ত্রণা, আবার কেউ তৃষ্ণার্ত লোভচিত্ত নিয়ে জন্ম নেয়। প্রকৃতপক্ষে স্বর্গ-নরক রূপে কোন আলাদা ভৌগলিক অবস্থান নেই। এটি শারিরীক ও মানসিক চেতনাগত জীবনানুভূতি। স্বর্গসুখানুভূতিও নরকদুঃখানুভূতির মেয়াদ সীমীত। মেয়াদ শেষে কার্যকারণ প্রক্রিয়ায় কর্মার্জীত জীবন নিয়ে হয় জন্মলাভ, যা মানুষ রূপেও হতে পারে।

প্রশ্নঃ- সত্তার কোথায় পুনজর্ন্ম হবে, তা কিসের উপর নির্ভর করে?

উত্তরঃ কৃতকর্মই এর নির্ধারক। কর্ম বলতে আমাদের সচেতন মনোগত ক্রিয়া কর্মকে বুঝায়। অতীত জীবনের কমর্ফলে বতর্মান জীবনের এবং বতর্মান জীবনের কমর্ফলে ভবিষ্যত জীবনের অবকাঠামো তৈরী হয়। মৈত্রী-করুণার আদর্শ চর্চায় ব্যক্তিসত্তার মধ্যে স্বর্গসুখ নিয়ে পুনর্জন্মের প্রবণতা, আর দুচিন্তাগ্রস্থ, নির্দয়, কামাসক্ত ব্যক্তি সত্তার মধ্যে নরকযন্ত্রণা নিয়ে পুনর্জন্মের প্রবণতা বিদ্যমান থাকে। বতর্মান জীবনের প্রবল মননশীলতা পরবর্তী জীবনে প্রবাহমাণ থাকে। তবে অধিকাংশ মানুষের মনুষ্য জীবন নিয়ে পুনর্জন্মের সম্ভাবনা থাকে। অতীত জীবনের কর্মফল বতর্মান জীবনের এবং বতর্মান জীবনের কমর্ফল ভবিষ্যত জীবনের অবকাঠামো তৈরী করে। একে অনেক সময় “অদৃষ্ট” বলে অপব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে।

প্রশ্নঃ- আমাদের জীবন কি কোনও অদৃশ্য শক্তির দ্বারা প্রভাবিত নয়? শুধু কর্ম দিয়েই পরিবর্তিত ও প্রভাবিত হয়?

উত্তরঃ আপন কর্মফল ছাড়া কোনও অদৃশ্য শক্তির এতে কোনও ভূমিকা নেই। কৃতকর্মের সাহায্যেই জীবন পরিবর্তন করা যায়। এই কারণেই আর্য অষ্টাঙ্গীক মার্গের একটি কমর্পন্থা হলো, সম্যক ব্যায়াম বা চেষ্টা। এই কর্মপ্রচেষ্টা কোন ব্যক্তির আন্তরিকতা কত প্রবল, তার উপর নির্ভর করবে এর ফলাফল। অনেকে আছেন যারা আপন মন্দ স্বভাব বদলাতে উদ্যোগী নন, পূর্ব কর্ম নির্ধারিত দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে সচেষ্ট নন; আবার অনেকে আছেন, যাঁরা অকুশলকর্ম বর্জন করে কুশলকর্মে ব্রতী হন। স্বভাব বদলানোর জন্য ধ্যান অপরিহার্য। কুশল কর্মে উদ্যোগ এবং অকুশল কর্ম বর্জনে সুফল লাভ হয়। একজন বৌদ্ধের লক্ষ্য হলো, নিজেকে দোষমুক্ত রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় অতীত জীবনে আপনার স্বভাবে যদি ধৈর্য, দয়ার অনুভূতি প্রবল থাকে তাহলে বর্তমান জীবনে সেই স্বভাব প্রবল থাকবে। বতর্মান জীবনে সেই গুণাবলীর আরও অনুশীলনের ফলে তা অধিকতর প্রবল হয়ে বিকাশ লাভ করবে। তবে এ কথা সত্য যে, দীর্ঘদিনের পুরাতন স্বভাব বদলানো কষ্টকর। যা একমাত্র ধ্যানের সাহায্যে আয়ত্ত করতে হয়। ধৈয্যশীল ও দয়াবান মানুষের সুসম্পর্ক থাকে সবার সঙ্গে। ফলে তিনি সবার মধ্যে সম্মানিত হয়ে সুখীজীবন যাপন করেন। অন্য একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে। মনে করুন আপনি অতীত জীবনে ধৈয্যশীল, দয়াবান, মৈত্রীভাবাপন্ন ছিলেন। বতর্মান জীবনে সেই গুণাবলীর প্রভাব নিয়ে আছেন; কিন্তু সেই গুণাবলীর অনুশীলন করে যদি আরও বিকাশ সাধনে উদ্যোগী না হন, তাহলে ক্রমশঃ ঐ গুণাবলীর লোপ পাবে। আপনার মধ্যে খিটখিটে মেজাজ, রাগ, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি প্রবল হয়ে দেখা দিবে। পক্ষান্তরে অতীত জীবনের খিটখিটে মেজাজ, রাগ, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি বর্জন করার অনুশীলনের ফলে কুশল গুণাবলী অর্জনে সফল হলে সুফল পাবেন, ব্যর্থ হলে কুফল ভোগ করবেন।

বলাবাহুল্য উক্ত সুফল-কুফল প্রাপ্তি, কার্যকারণ প্রক্রিয়াতে সংঘটিত হয়। এখানে অদৃশ্য দ্বিতীয় অলৌকিক শক্তির কোন ভূমিকা নেই।

প্রশ্নঃ- আপনি পুর্নজন্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ আছে?

উত্তরঃ এর স্বপক্ষে গ্রহণযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে। অতীত জীবনের স্মৃতি নিয়ে জন্মলাভের প্রকাশিত খবর নিয়ে গত প্রায় ৩০ বছর ধরে মনোবিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন। উদাহরন স্বরূপ উল্লেখ্য, ইংল্যান্ডের ৫ বছর বয়সী একজন মেয়ে পোল্যান্ডে তাঁর অতীত জীবনের মা-বাবার, সেখানকার বাড়ীর ঠিকানা খুঁজে পেয়েছেন এবং কিভাবে ২৩ বছর বয়সে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ২ দিন পর মারা যান, তার নিখুঁত বর্ণনা দেন। মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে তাকে প্রশ্ন করে ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন। এটিই একমাত্র ঘটনা নয়। ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আইয়েন ষ্টিভেশন্ তাঁর রচিত গ্রন্থে অনুরূপ কয়েক ডজন ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যাতে বৌদ্ধদর্শনে ব্যাখ্যাত পূনর্জন্মের সত্যতা প্রমাণ করে।[সূত্রঃ ইউনিভাসিরটি প্রেস অব ভাজির্নিয়া, চারলোটেভিলি, ইউ, এস, এ, ১৯৭৫ পুনজর্ন্ম সম্পর্কিত ২০টি ঘটনা]

প্রশ্নঃ- কেউ কেউ মনে করেন অতীত জীবনের স্মৃতির ব্যাপারটি ভৌতিক হতে পারে। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি?

উত্তরঃ কেউ কোন বিষয়ে বিশ্বাস করেন না- এই অজুহাতে বিষয়টিকে ভৌতিক ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিতে পারেন না। কোন বিষয়ে ভিন্নমত পোষনের স্বপক্ষে আপনার উচিত গ্রহণযোগ্য প্রমাণ দেয়া। ভৌতিক কারসাজির স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। ভৌতিক ব্যাপারটি কুসংষ্কারের অন্ধবিশ্বাস।

প্রশ্নঃ- আপনি বলেছেন ভৌতিক কারসাজি কুসংস্কার। পুনজর্ন্মের ব্যাপারটি কি কুসংস্কার নয়?

উত্তরঃ অভিধানিক অর্থে কুসংষ্কার হলো এমন ধারণা যার স্বপক্ষে কোন যুক্তি নির্ভর তথ্যপ্রমাণ নেই। এটি ভোজবাজী ম্যাজিকের মতো। ভৌতিক ঘটনাগুলো প্রমাণের স্বপক্ষে কোন বৈজ্ঞানিক বা বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক তথ্য-প্রমাণ নেই তাই এটি কুসংষ্কার। কিন্তু পূনজর্ন্ম সম্পর্কে পূর্বোল্লিখিত সমীক্ষা বাস্তব অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত ও বিজ্ঞান সম্মত। অতএব কুসংষ্কার বলে এটি উড়িয়ে দেয়া যায় না।

প্রশ্নঃ- এমন কোন বিজ্ঞানী আছেন যিনি পূর্বজন্মে বিশ্বাস করেন?

উত্তরঃ আছেন। থমাস্ হাক্সলের নাম উল্লেখ করতে পারি। এই বিজ্ঞানী উনবিংশ শতাব্দীর বৃটিশ বিজ্ঞান গবেষণার পথিকৃত। ডারউন তথ্যের সত্যতা তিনি প্রমাণ করেন। তাঁর মতে পূর্বজন্ম একটি বিজ্ঞান সম্মত সত্য। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "ইভলিয়শান এন্ড এথিক্স এন্ড আদার এসেস্"-এ লিখেছেন, *"ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের ইতিবৃত্তান্তে ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, বিশ্ব প্রকৃতির কসইমক শক্তির সঙ্গে মনুষ্য জীবনের আন্তঃ গমন-নির্গমন তথ্যে সত্য নিহিত আছে। গভীর বিশ্লেষনের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয় না বলে সত্যটি অনেকের কাছে স্পষ্ট নয়। জীবজগতের বিবর্তন তত্ত্ব ও পুনর্জন্ম তত্ত্ব সমতুল্য"।*

এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সহকর্মী সুইডিস জ্যোর্তিবিজ্ঞানী ও পদার্থ বিজ্ঞানী অধ্যাপক গুনটেপ্ স্ট্রমবার্গ এর পূনর্জন্ম সম্পর্কে মন্তব্য হলো- *"মানুষের আত্মার পূনর্জন্ম হয় কিনা, সে সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ আছে। ১৯৩৬ সালে ভারত সরকার একটি বিষ্ময়কর ঘটনার অনুসন্ধান করে রিপোর্ট প্রদান করে। দিল্লীতে বসবাসকারী শান্তি দেবী নামের এক বালিকা দিল্লী থেকে ৫০০ মাইল দূরবর্তী মথুরায় তাঁর পূর্বজন্মের স্মৃতি সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দেয়। তাঁর স্বামীর, সন্তানদের নাম, বাড়ীর ঠিকানা এবং প্রতবেশীদের নিয়ে নানা ঘটনার পুংখানুপুঙ্খ বর্ণনার সত্যতা যথাযথ অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে। এই ধরনের আরও ঘটনা মানুষের স্মৃতির অবিনাশ থাকার সত্যতা প্রমাণ করে। বৃটিশ বিজ্ঞানী, ইউনেস্কোর ডাইরেকটার জেনারেল অধ্যপক জুলিয়ান হাসলের মন্তব্য হলো-পুনর্জন্ম বিজ্ঞান সম্মত। বেতার মাধ্যমে সংবাদ প্রচারের সঙ্গে পুনর্জন্ম প্রক্রিয়ারমিল আছে। বেতারে সংবাদ প্রেরণ ও গ্রাহক যন্ত্রে ধারণ প্রক্রিয়ার মতো পূনর্জন্ম প্রক্রিয়ায় দেহ থেকে দেহান্তরে প্রবাহিত হবার ক্ষেত্রে আত্মসত্তার ভূমিকা বিদ্যমান। মন ঐ ভূমিকার চালিকাশক্তি"।*

আমেরিকার শিল্পপতি হেনরীফোর্ডের মত একজন বাস্তববাদী ব্যক্তিত্বের পূনর্জন্ম সম্পর্কে বক্তব্যঃ

"আমি আমার ২৬ বছর বয়সে পুনর্জন্মে বিশ্বাসী হই। আমার নিজ ধর্ম বিশ্বাসে এ ব্যাপারে কোন ভূমিকা ছিল না।পুপূর্ব জন্মে বিশ্বাসের ফলে আমার জীবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার সুযোগ পাবার স্বস্তিবোধ করি। এক জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ও অভিজ্ঞতার অসমাপ্ত কাজ যদি এ জীবনে সম্পন্ন না হয় তাহলে আমার অনেক পরিশ্রম পন্ডশ্রমে পর্যবশিত হবার আশঙ্কা ছিল। পুনর্জন্মে বিশ্বাসের ফলে মনে হয়, আমার কাজের সমৃদ্ধি ও সংশোধনের সুযোগ পাব। আমি আর সময়ের দাস নই। অনেকে মনে করেন প্রতিভা একটি অনুদান। প্রকৃতপক্ষে প্রতিভা হলো অভিজ্ঞতার ফসল। অভিজ্ঞতার ফসল প্রতিভা বিকাশের সুযোগ যদি এ জীবনে সম্পন্ন করার

সুযোগ পাবো এই বিশ্বাসে আমার কর্ম পরিকল্পনা বৈশ্বিক পর্যায়ে বিস্তৃত করার তাগিদ অনুভব করি। আমি এই অভিজ্ঞতার কথা সবাইকে জানাতে চাই"।

উপরের পর্যলোচনায় স্পষ্ট ধারণা জন্মে, পুনর্জন্ম একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞান ভিত্তিক বিষয়। বস্তুতপক্ষে বিষয়টি যথার্থ উন্নীত জীবন স্তরে গিয়ে উপলদ্ধির বিষয়, গবেষণাগারে পরীক্ষার বিষয় নয়। এ জীবনের ভুল সংশোধন করা যাবে না অসমাপ্ত কাজ করার সুযোগ থাকবে না, এইরূপ চিন্তাধারা জীবনমূখী নয়। পুনর্জন্ম আমাদের সেই সুযোগের আশ্বাস দেয়। বৌদ্ধ দর্শনের লক্ষ্য নির্বাণ লাভ এ জীবনে না হলে পরবর্তী জীবনে সেই সাধনা অব্যাহত থাকবে। এ জীবনের ভুল, অসম্পূর্ণতাগুলি পরবর্তী জীবনে সংশোধন ও সমাপ্ত করার, ভুল থেকে শিক্ষা লাভ করার, এ জীবনে যা অর্জিত হয়নি তা পরবর্তী জীবনে অর্জনের সম্ভাবনার কথা কি অপূর্ব আনন্দময়!

[দুগ্ধ যেমন সঙ্গে সঙ্গে দধি হয় না, সুকর্ম, কুকর্মও তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সুফল, কুফল দেয় না। ভস্ম দিয়ে আচ্ছাদিত শিখাহীন আগুনের মতো অকুশলকারী কে যথাসময়ে কুফল দেয়। সুফল, কুফল প্রপ্তি শুধু সময়ের ব্যাপার।]

....
....

ধ্যান-সমাধি

প্রশ্নঃ- ধ্যান-সমাধি বা ভাবনা কি?

উত্তরঃ ধ্যান-সমাধি বা ভাবনা হলো, মনের কার্যকলাপ উন্নয়নের সচেতন প্রচেষ্টা। পালি ভাষায় ভাবনা অর্থ হলো গড়ে তোলা বা বৃদ্ধি করা।

প্রশ্নঃ- ধ্যানের তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ ধ্যান বা ভাবনার গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা যতই ভালো হতে চাই না কেন, তা সম্ভব হবে না, যদি আমাদের মনে সৎ হবার সদা সচেতন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা না হয়। উদাহারণ স্বরুপ বলা যায়, নিজ স্ত্রীর প্রতি অসহনশীল স্বামী প্রতিজ্ঞা করলেন, এখন থেকে তিনি স্ত্রীর প্রতিসহনশীল হবেন। কিন্তু পরমুহুর্তে স্ত্রীর সঙ্গে চেঁচামেচি শুরু করলেন।

এর কারণ তার কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি মনকে প্রহরীর মত সদাসচেতন রাখেননি। ফলে তাঁর অজ্ঞাতেই তিনি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন। ভাবনা বা ধ্যান-সমাধি নিজের মনের উপর প্রহরীর মত সদা সচেতন থাকার শক্তি ও অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

প্রশ্নঃ- আমি শুনেছি, ধ্যান কখনো কখনো বিপদজ্জনক হতে পারে; তা কি সত্য?

উত্তরঃ এর উত্তর এভাবে দেয়া যায়। বাঁচার জন্য আমাদের লবনের প্রয়োজন। কিন্তু আপনি যদি একসঙ্গে ১ কিলোগ্রাম লবন খেয়ে ফেলেন, তাহলে আপনার মৃত্যু ঘটবে। আধুনিক জীবন যাপনের জন্য গাড়ী প্রয়োজন। কিন্তু আপনি যদি ট্রাফিক আইন না মেনে গাড়ী চালান, তাহলে আপনার বিপদ হবে। ধ্যান-সমাধি বা ভাবনাও তদ্রুপ। আমাদের ধ্যান অনুশীলন প্রকৃত সুখ-শান্তির জন্য অপরিহার্য, কিন্তু সঠিকভাবে চর্চা না করলে সমস্য দেখা দিবে। অনেকের ভুল ধারণা হলো মানসিক চাপ, অমূলক ভীতি এবং স্কিজোপ্রেনিয়ার মতো অসুখ ধ্যান অভ্যাসে নিরাময় হয়। এই জাতীয় অসুখে প্রথমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসা নেয়া উচিত। কিছুটা সুস্থ হবার পর ধ্যান অভ্যাস শুরু করতে হয়। শুরুতে অনেকক্ষণ ধ্যান করলে ক্লান্তি আসে। ক্যাঙারু ধ্যান আরও ক্ষতিকর। এই পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে, কখনও নিজে বই পড়া পদ্ধতিতে ক্যাঙারুর মতো লাফিয়ে লাফিয়ে ঘন ঘন পদ্ধতি পরিবর্তন করে ধ্যান চর্চা করলে ক্ষতি হয়। কোন জটিল মানসিক রোগ না থাকলে ধ্যান সমাধি বা ভাবনা মানসিক উৎকর্ষ সাধনে অশেষ উপকার সাধন করে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে অনেক শারিরীক রোগ মানসিক কারণে সৃষ্টি হয়।

প্রশ্নঃ- কত প্রকার ধ্যান পদ্ধতি আছে?

উত্তরঃ বুদ্ধ বিভিন্ন পদ্ধতির ধ্যান শিক্ষা দিয়েছেন। এক পদ্ধতি এক রকম মানসিক সমস্যার সমাধান ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করে থাকে। তবে দু'প্রকারের ধ্যান পদ্ধতি সব চাইতে বেশী উপকারী। এর একটি হলো সচেতন শ্বাস-প্রশ্বাস ভিত্তিক অর্থাৎ আনাপানা স্মৃতি, অন্যটি হলো মৈত্রী ভাবনা বা মেত্তা স্মৃতি।

প্রশ্নঃ- "আনাপানা" পদ্ধতি কিভাবে করতে হয়?

উত্তরঃ আপনি 'পি' অক্ষর দিয়ে শুরু চার শব্দের চারটি সহজ ধাপে ধ্যান করতে পারেন। যেমন, প্রথম ধাপে প্লেস বা স্থান নির্বচন; এমন স্থানে বসে ধ্যান করতে হবে, যেখানে কোন গোলমাল নেই। দ্বিতীয় ধাপে পজিশন বা শরীরের অবস্থান-আরামদায়ক স্থানে হতে হবে। হাটু ভাঁজ করে আরামে কোলের উপরে বাম হাতের তালুর উপর ডান হাতের পিঠ রেখে, শির দাড়া (মেরুদন্ড) সোজা রেখে চোখ বন্ধ করে আসন নিন। এর বিকল্প অবস্থান হতে পারে চেয়ারে শিরদাড়া সোজা রেখে বসা। পা থেকে মাথার তালু পযর্ন্ত, নীচ থেকে উপরের দিকে পর্যায়ক্রমে প্রত্যক গিট, মাংসপেশী শিথিল করে আসন নিতে হবে। তৃতীয় ধাপে প্রাকটিস বা আসল ধ্যানানুশীলন- এতে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় শ্বাস ছাড়া(বিলয়) এবং শ্বাস নেয়া (উদয়) এর মধ্যে মনঃসংযোগ করা। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নাভির ওঠানামার মধ্যে অথবা শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে মনঃসংযোগ রাখতে পারেন। চতুর্থ ধাপে প্রোবলেম বা ধ্যানের সময় মনঃসংযোগে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন-শরীরের বিভিন্ন জায়গায় চুলকানী অনুভব, হাটুতে ব্যাথা দেখা দিতে পারে। এতে নড়াচড়া না করে, অস্থির না হয়ে, যে জায়গায় চুলকাচ্ছে বা ব্যাথা করছে সেই হাটু বা স্থান শীথিলভাবে রাখার অনুভুতি আনতে হবে। কোথাও চুলকানো অপরিহার্য হলে মনঃসংযোগ সহকারে হাত তোলা, নেয়া, চুলকানো, আবার হাত যথাস্থানে ফিরিয়ে আনা, সবই মনঃসংযোগ সহকারে করতে হবে এবং যথাশীঘ্র পুনরায় নাভি ওঠানামার মধ্যে মনঃসংযোগ ফিরিয়ে আনতে হবে। এছাড়া অস্থির মন বিক্ষিপ্তভাবে এখানে-সেখানে, এবিষয়-ওবিষয়ে ছোটাছুটি করে। তখন ধৈয্যের সাথে তাড়াহুড়া না করে, মনঃসংযোগ যথাশীঘ্র নাভির ওঠনামার মধ্যে বারবার ফিরিয়ে আনতে হবে। এভাবে অনুশীলন করতে করতে, অনুশীলন অব্যাহত রাখলে ক্রমান্বয়ে অস্থির-বিক্ষিপ্ত চিত্ত বা ছোটাছুটি করা মন স্থির হয়ে আসবে, মনঃসংযোগ শক্তিশালী হয়ে ওঠবে এবং মনের গভীরে প্রশান্ত মুহূর্তগুলোর উদয় হবে। এক কথায় আপাদমস্তক দেহ প্রশান্ত শীথিলতায় উপবিষ্ট আসনে অথবা শয্যায় সমর্পিত করে মনকে দেহের মধ্যে সংযুক্ত করে। দেহ মনের এ গতিবিধি পর্যবেক্ষণের নাম ধ্যান, ভাবনা বা সমাধি।

প্রশ্নঃ- কতক্ষণ ধ্যান করা উচিত?

উত্তরঃ প্রথম সপ্তাহে প্রতিদিন ১৫ মিনিট। তারপর প্রতি সপ্তাহে ৫ মিনিট করে বাড়াতে থাকুন। এভাবে প্রতি দিন ৪৫ মিনিট করে ধ্যানাভ্যাস এবং নিয়মিত ধ্যানানুশীলন করলে অনুভব করবেন আপনার মনসংযোগের সময়সীমা বৃদ্ধিলাভে মনের বিক্ষিপ্ত ছোটাছুটি, অস্থিরতা হ্রাস পাচ্ছে, ক্রমান্বয়ে আপনি মনের ও শরীরের শিথিল, প্রশান্ত অনুভূতিপূর্ণ মুহুর্তের সন্ধান পাচ্ছেন।

[*** আপনি যদি এমন ব্যক্তির সন্ধান পান, যিনি অনুসন্ধানী দৃষ্টিনিয়ে আপনার ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করতে আগ্রহী সেই ব্যক্তিই আপনার কল্যাণমিত্র।]

প্রশ্নঃ- "মেত্তাভাবনা" ধ্যান কিভাবে করতে হয়?

উত্তরঃ আনাপানা পদ্ধতির ধ্যানাভ্যাস রপ্ত হবার পর মেত্তাভাবনা পদ্ধতির ধ্যান শুরু করতে হয়। আনাপানা পদ্ধতিতে ধ্যান করার পর মেত্তাভাবনা পদ্ধতি শুরু করবেন। এটি সপ্তাহে ২/৩বার করতে পারেন। এই পদ্ধতি হলো- প্রথমে নিজের উদ্দেশ্যে মনে মনে বলুন, "আমি যেন ভালো থাকি, সুস্থ থাকি, ধীর-স্থির থাকি, বিপদমুক্ত, রোগমুক্ত ও শত্রুমুক্ত হই; আমার মন দ্বেষমুক্ত হোক, অন্তর মৈত্রী-করুণাময় হোক"। এরপর অনুরুপ মঙ্গল কামনা প্রথমে আপনার প্রিয়(বাবা-মা, শিক্ষাগুরু, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন,বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী) ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে, তারপর নিরপেক্ষ (আপনার প্রিয়ও নয় অপ্রিয়ও নয়) ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে, সবশেষে আপনার পছন্দ নয় এমন ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে করুন। মনে মনে বলুন, এরা সবাই যেন নিজের মতো সুখে-শান্তিতে বসবাস করেন।

প্রশ্নঃ- মেত্তাভাবনার উপকারীতা কি?

উত্তরঃ আপনি আন্তরিক অনুভূতি নিয়ে সবার মঙ্গল কামনা করলে, নিজের মধ্যে প্রশান্তিময় এক শুভ চেতনা অনুভব করবেন। দেখতে পাবেন, আপনি সবার কাছে ক্রমশঃ গ্রহণযোগ্য, ক্ষমাশীল হয়ে উঠেছেন, আপনার প্রিয় ব্যক্তিদের প্রতি আপনার ভালবাসা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাদের প্রতি আপনি উদাসীন ছিলেন, আপনার ক্ষোভ ও বৈরীভাব ছিল, তাদের প্রতি অকুশল ভাব হ্রাস পেয়ে করুণা-উপেক্ষা-মৈত্রী ভাবের উদয়

হচ্ছে। এমনকি গভীর মনোসংযোগের ধ্যানে কোন রোগীকে অন্তঃর্ভূক্ত করলে রোগীর অবস্থার উন্নতি ঘটবে।

প্রশ্নঃ- ঐ ব্যাপারটি কিভাবে সম্ভব হয়?

উত্তরঃ মনকে সম্যকভাবে ধ্যানের একাগ্রতায় সংগঠিত করতে সফল হলে, মন এক শক্তিশালী যন্ত্রের মত শক্তি সঞ্চয় করে। মনের ঐ শক্তিকে অন্যের প্রতি যথার্থভাবে প্রয়োগ করতে সফল কাম হলে তা কার্যকরী হয়ে উঠে। আপনার এমন অভিজ্ঞতাও থাকতে পারে, অনেক লোকের ভীড়ের মধ্যে আপনি অনুভব করছেন, কেউ আপনাকে লক্ষ্য করছেন। এর কারণ, আপনার মননশক্তি ঐ ব্যক্তির গ্রাহক যন্ত্র হিসেবে কাজ করছে। এটি মেত্তাভাবনার প্রভাব যা ভাবনাকারী পর্যবেক্ষণ করবেন।

প্রশ্নঃ- ধ্যান শিক্ষার জন্য কি কোনও শিক্ষকের প্রয়োজন?

উত্তরঃ শিক্ষক অপরিহার্য নয়। তবে অভিজ্ঞ ব্যক্তির নির্দেশ অবশ্যই সাহায্য করে। দুর্ভাগ্য বশতঃ অভিজ্ঞ শিক্ষক পাওয়া যায় না। ভালভাবে অনুসন্ধান করে প্রশিক্ষক নির্বাচন করা উচিত। তা না হলে বিপরীত ফল হতে পারে।

প্রশ্নঃ- শোনা যায় মনস্তত্ত্ববিদ কিংবা মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞরা সম্প্রতি তাদের কাজে ধ্যান পদ্ধতি ব্যবহার করছেন; একথা কি সত্য?

উত্তরঃ কথাটি সত্য। সম্প্রতি রোগ চিকিৎসায় ধ্যান-পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। বিশেষতঃ আত্মসচেতনতা সৃষ্টি, অমূলক ভীতি দূরীকরণ কিংবা দুচিন্তাগ্রস্থ রোগীর প্রশান্তি প্রদানের জন্য। বুদ্ধের আবিষ্কৃত বিশ্লেষনধর্মী মনের তথ্য অদ্যাবধি মানুষকে অজ্ঞানজনিত দুঃখ থেকে মুক্তি দিয়ে অপ্রমেয় শান্তি প্রদান করে যাচ্ছে।

[*** যে ব্যক্তি অন্যকে সৎ শিক্ষার উপদেশ দেন এবং অকুশল কর্ম থেকে বিরত রাখেন তিনি সৎ লোকের প্রিয় ও অসৎ লোকের বিরাগভাজন হন।]

[*** যিনি অকুশল কর্ম করেছেন, তিনি যেন পুনর্বার তা না করেন, তিনি যেন কুশল কর্মে আনন্দ এবং অকুশল কর্মে দুঃখবোধ করেন।]

....

....

প্রজ্ঞা ও করুণা

প্রশ্নঃ-প্রজ্ঞা ও করুণার কথা বৌদ্ধধর্ম দেশনায় প্রায় শোনা যায়। "প্রজ্ঞা-করুণা বলতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ ভালোবাসা ও করুণাকে কোন কোন ধর্মে সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলী বলে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু প্রজ্ঞার কথা উল্লেখ থাকে না। প্রজ্ঞা ছাড়া ভালোবাসা ও করুণায় গুণান্বিত হয়ে আপনি একজন সহৃদয় ব্যক্তি হতে পারেন বটে, কিন্তু অবোধ থেকে যাবেন। কারণ প্রজ্ঞার অভাবে আপনার মধ্যে নানা বিষয় সম্পর্কে বিচার বুদ্ধির অভাব থেকে যাবে। বস্তুবাদী বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে করুণা-ভালোবাসার মতো কোমল অনুভূতি গুলোর গুরুত্ব নেই। এতে প্রকৃতপক্ষে একজন বিজ্ঞানী হৃদয়বৃত্তি বর্জিত রোবোটে পরিণত হন। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত প্রযুক্তি মানুষের সেবা না করে শোষণ ও শাসনে ব্যবহৃত হতে থাকে। এর প্রমাণ মেলে বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে জীবাণু মারণাস্ত্রের মতো বিধ্বংসী অস্ত্র তৈরী করার মধ্যে। আধুনিক বস্তুবাদী দর্শনে যুক্তি, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও মেধাকে ভালোবাসা, করুণা ও মৈত্রীর প্রতিপক্ষ বিষয় রূপে অপব্যাখ্যা করা হয়। ফলে বুদ্ধিবৃত্তির সংঙ্গে হৃদয়বৃত্তির সমন্বয় ঘটে না। এতে যেখানে বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়েছে, সেখানে ধর্ম মূল্য হরিয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনের মতে একজন প্রকৃত বিজ্ঞ মানুষের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির ভলোবাসা ও করুণার সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রজ্ঞার সমন্বয় ঘটাতে হবে। বৌদ্ধ দর্শনে প্রজ্ঞা ও করুণার মধ্যে সমন্বিতি গুরুত্ব আরোপনের ফলে বিজ্ঞানের সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের কোন সংঘাত ঘটে না। দৈনন্দিন জীবনে কায়মনো বাক্য দ্বারা সকল কর্মে কাম-ক্রোধ-লোভ-দ্বেষ বর্জন এবং মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষা গুণাবলী অর্জনের অনুশীলন হলো প্রকৃতপক্ষে প্রজ্ঞা ও করুণার মর্মবাণী।

প্রশ্নঃ- বৌদ্ধ দর্শন মতে প্রজ্ঞা বলতে কি বোঝায়?

উত্তরঃ বৌদ্ধ দর্শনে দেশিত প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে জীবন জগতের সবকিছু প্রকৃতপক্ষে অসম্পূর্ণ(চরম এবং চূড়ান্ত নয়), অনিত্য বা অস্থায়ী(সদা

পরিবর্তনশীল) এবং অনাত্ম(আত্ম বিহীন) অর্থাৎ নিজ বলতে কিছুই নেই, যেহেতু প্রতিমুহুর্তে ‘নিজ’ অবিরাম পরিবর্তনের আয়ত্তাধীন। তবে বুদ্ধ সবার কাছে প্রজ্ঞার কথা বলতেন না। কারণ প্রজ্ঞার অর্থ হৃদয়াঙ্গম করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রজ্ঞা হলো নিজে প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করে হৃদয়াঙ্গম করা। প্রজ্ঞার বিধান হলো চারিপাশের সবকিছু স্থান, কাল বিশেষে বিশ্লেষন করে খোলা মনে সবকিছুর সত্যতা মূল্যায়ন করা। নিজের বদ্ধমূল মতামত নিয়ে আবদ্ধ থাকা নয়, অন্যের মতামত ধৈয্যের সঙ্গে শোনা ও পরীক্ষা করা। প্রজ্ঞা বলতে বোঝায় প্রচলিত সংস্কারে নিবদ্ধ না থেকে সম্যক দৃষ্টিতে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে নিজের অভিমত স্থির করা। যথার্থ প্রমাণ ও যুক্তির আলোকে যে কোন সময় নিজের মতামত পরিবর্তন করতে প্রস্তুত থাকা। যিনি অনুরূপভাবে আচরণ করেন, তিনিই প্রজ্ঞাবান। শোনা কথা বা প্রচলিত সংস্কারে বিশ্বাস করা সহজ। বুদ্ধ নির্দেশিত প্রজ্ঞার পথে চলতে হলে প্রয়োজন হয় সৎসাহস, ধৈয্য, নমনীয়তা ও বুদ্ধিমত্তা। বৌদ্ধ দর্শনের এই সব গুণাবলী হলো প্রজ্ঞার মর্মবাণী।

প্রশ্নঃ- মনে হয় বৌদ্ধ দর্শন সাধারণ মানুষের কাছে সহজে বোধগম্য নয়। এইক্ষেত্রে দর্শনের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?

উত্তরঃ একথা সত্য বৌদ্ধ দর্শনের সকল বিষয় সাধারণ মানুষের কাছে সহজে বোধগম্য নয়, তাই বলে এর প্রয়োজনীয়তা নেই একথা বলা যায় না। জীবন জগতের কঠোর, কঠিন সত্য বুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতায় উন্মোচিত হয়েছে যা বৌদ্ধদর্শনে বিধৃত। এখন কেউ তা বুঝতে না পারলে, ভবিষ্যত কর্মপ্রচেষ্টায় তা পারবেন। এই কারণে বৌদ্ধরা ধৈর্য সহকারে নিরবে নিভৃতে বৌদ্ধ দর্শন বিষয়কে উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হন। ধ্যান অভ্যাস এজন্য অবশ্য করণীয়। বুদ্ধ করুণা পরবশঃ হয়ে মানুষের দুঃখমুক্তির জন্য তাঁর সাধনালব্দ সত্য মানুষের কাছে প্রচার করেছিলেন। আমরাও সেই উদ্দেশ্যে তা প্রচার করি।

প্রশ্নঃ- এবার বলুন করুণা কি?

উত্তরঃ প্রজ্ঞা যেমন আমাদের স্বভাব-চরিত্রের বৃদ্ধি ও মেধার দিক নির্দেশ করে, ‘করুণা’ অনুরূপভাবে আমাদের স্বভাব-চরিত্রের কোমল অনুভূতির

দিকটি নির্দেশ করে। প্রজ্ঞার মতো করুণা একটি অপরূপ মানবিক গুণ। করুণার ভাবার্থ ইংরেজী compassion শব্দের co এবং passion দিয়ে বুঝানো যেতে পারে। co অর্থ সমবায় বা সম্মিলিত এবং passion অর্থ সহমর্মিতা বা সহানুভূতি। অর্থাৎ করুণা বলতে কারও অবস্থা(দুঃখ-কষ্ট)কে সহানুভূতির সঙ্গে উপলব্ধি এবং অপরের দুঃখ-কষ্ট উপশম করার সচেতন প্রচেষ্টা বুঝায়। একজন করুণাসিক্ত ব্যক্তি নিজের প্রতি যে ভালবাসা পোষণ করেন, সেই ভালোবাসাতেই অন্যের দুঃখ অনুভব করেন। নিজেকে সঠিকভাবে বুঝতে পারলেই অপরকে বুঝা সম্ভব। নিজের জন্য যা উত্তম অন্যের জন্যেও তা উত্তম মনে করেন। নিজের প্রতি সহমর্মী হবার পর অন্যের প্রতি সহমর্মী হওয়া সম্ভব হয়। বৌদ্ধিক জীবনাচরণে নিজের স্বরুপ সম্পর্কে জ্ঞাত হলে অন্যের মঙ্গল কামনা অনুভূত হয়। কারণ জগতে জীবনের স্বরুপ এমন, সেখানে সবার প্রতি করুণা ছাড়া নিজের প্রকৃত সুখ-শান্তি পাওয়া যায় না। বুদ্ধের জীবনাচরণে এই সত্যটি মহিমান্বিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তাঁর দীর্ঘ ৬ বছরব্যাপী কঠোর সাধনালব্দ জ্ঞান, মানুষের প্রতি করুণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রচার করেছিলেন।

প্রশ্নঃ- আপনি বলেছেন নিজের কল্যাণ করার পর অন্যের কল্যাণ করা সম্ভব। এটি কি স্বার্থপরতা নয়?

উত্তরঃ সাধারণত স্বার্থপরতা বলতে নিজের কল্যাণে এবং নিঃস্বার্থপরতা বলতে অন্যের কল্যাণে কর্মসম্পাদন বুঝায়। এর কোনটিকে বৌদ্ধদর্শনে ঐরূপ আলাদাভাবে না দেখে দুটিকে একীভূত করে দেখা হয়। এতে জ্ঞানের আলোকে জ্ঞাত স্বার্থ চিন্তা ক্রমশঃ স্বার্থপরতা থেকে অন্যের স্বার্থ চিন্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে আবির্ভূত হয়। সহমর্মীতা দিয়ে মা তাঁর একমাত্র সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন, সেইরূপ সহমর্মীতায় সকল জীবের প্রতি মঙ্গল কামনা হলো ‘করুণা’। বৌদ্ধিক গুণাবলী খচিত মুকুটে ‘করুণা’ একটি অমূল্য রত্নের মতো শোভা পায়।

[***যথাশীঘ্র কুশলকর্ম সম্পাদনে উদ্যোগী হও। নিজের মন অকুশল কর্মে লিপ্ত কিনা পয্যবেক্ষণ করো। কুশলকর্ম সম্পাদনে বিলম্ব হলে মন অকুশলকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে।]

. . . .
. . . .

নিরামিষবাদ

প্রশ্নঃ- বৌদ্ধদের নিরামিষভোজী হওয়া উচিত নয় কি?

উত্তরঃ কোন বৌদ্ধকে অবশ্যই নিরামিষাশী হতে হবে- একথা ঠিক নয়। বুদ্ধ স্বয়ং নিরামিষাশী ছিলেন না। তাঁর অনুসারীদের তিনি কখনো নিরামিষাশী হতে উপদেশ দেননি। নিরামিষাশী নন এমন প্রকৃতবৌদ্ধ বর্তমানে বহু আছেন।

প্রশ্নঃ- কিন্তু আপনি যদি মাছ-মাংস খান, তাহলে পরোক্ষভাবে প্রাণীহত্যার জন্য দায়ী হচ্ছেন, যেখানে পঞ্চশীলের প্রথম শীল লঙ্ঘন করছেন, তাই নয় কি?

উত্তরঃ হ্যাঁ, একথা অনস্বীকার্য। যদি আমি মাছ-মাংস খাই, তাহলে পরোক্ষভাবে প্রাণী হত্যার জন্য দায়ী; কিন্তু নিরামিষভোজী হলেওতো পরোক্ষভাবে প্রাণী হত্যার জন্য দায়ী হতে হয়। কারণ কৃষকরা যেখানে চাষাবাদ করেন সেখানে কীটনাশক ঔষধ ব্যবহারের ফলে কীটপতঙ্গ মারা যায়। এছাড়া ব্যবহৃত চামরার বেল্ট, ব্যাগ, সাবান প্রভৃতি তৈরীতে পরোক্ষভাবে প্রাণী হত্যা করতে হয়। অতএব প্রকৃত পক্ষে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে প্রাণী হত্যা না করে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাই চতুরার্য সত্যের প্রথম সত্যে বলা হয়েছে যে, বেঁচে থাকাটাই দুঃখ জনক। এইজন্য পঞ্চশীলের প্রথমশীলে প্রাণী হত্যার জন্য সরাসরি দায়ী হতে বারণ করা হয়েছে। এখানে সরাসরি কথাটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রানীহত্যার বিষয়ে প্রাণীহত্যা হলো কিনা, তার চাইতে প্রাণী হত্যার জিঘাংসা চেতনাকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এটিই প্রথমশীলের কুশল ব্যাখ্যা।

প্রশ্নঃ- মহাযানী বৌদ্ধেরা তো মাছ-মাংস খান না।

উত্তরঃ ঐ কথা সত্য নয়। চিনের মহাযানী বৌদ্ধেরা নিরামীষাশী হতে গুরুত্ব দেন বটে, তবে জাপান ও তিব্বতের মহাযানী বৌদ্ধ গৃহী এবং ভিক্ষুরাও মাছ-মাংস খান।

প্রশ্নঃ- বৌদ্ধদের মাছ-মাংস খাওয়া উচিত না। এই সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তরঃ মনে করুন, কোন ব্যক্তি নিরামিষভোজী হওয়া সত্ত্বেও জীবনাচরনে স্বার্থপর, অসদাচারী ও সংকীর্ণ। অন্য একজন নিরামীষভোজী নন, কিন্তু সদচারী, ত্যাগী ও করুণাপরবশ। এ দুজনের মধ্যে বৌদ্ধ হিসেবে কে উত্তম?

প্রশ্নকারীঃ জীবনাচরনে যিনি সদচারী তিনি অবশ্যই অপেক্ষাকৃত উত্তম।

উত্তর দাতাঃ কেন?

প্রশ্নকারীঃ কারণ ঐ ব্যক্তি আমিষভোজী হলেও সদাচারী।

উত্তরদাতাঃ প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়টি প্রধান বিচায্য বিষয়। একজন নিরামিষাশী যেমন সদাচারী হতে পারেন, একজন আমিষভোজী তেমনি সদাচারী হতে পারেন। বুদ্ধ তাঁর হিতোপদেশে মানুষের চেতনার উপর সবচেয়ে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জগত জীবনে সবকিছুই আপেক্ষিক, এখানে চূড়ান্ত ও চরম বলে কিছুই নেই। বিষয়টি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের আপেক্ষিক সূত্রের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ যা বৌদ্ধ দর্শনে 'মজ্ঝিমপন্থা' সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

....
....

সৌভাগ্য ও অদৃষ্ট

প্রশ্নঃ- তান্ত্রিকতা ও ভাগ্যগণনা সম্পর্কে বুদ্ধর অভিমত কি?

উত্তরঃ ভাগ্য গণনা, রক্ষাকবচ এবং গৃহনির্মাণ ও যাত্রায় শুভ অশুভ দিন ধায্যকরণকে বুদ্ধ অর্থহীন কুসংস্কার আখ্যায়িত করে তাঁর অনুসারীদের এই আচারাদি পালন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

প্রশ্নঃ- এতে কোনও সত্যতা না থাকলে অনেকে কেন তান্ত্রিকতা বিশ্বাস ও চর্চা করেন?

উত্তরঃ লোভ, ভয় ও অজ্ঞতার কারণে এগুলির চর্চা করা হয়। বুদ্ধের উপদেশ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায়, এক টুকরা কাগজ, ধাতব মুদ্রাখন্ড, কিংবা অন্য কোনও পাথর কণা অপেক্ষা মানুষের মহৎ

হৃদয়বৃত্তিজাত কুশলকর্ম অনেক বেশী শক্তিশালী। বুদ্ধের গভীর সাধনালব্দ বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান-আলোকে মানুষ সদাচার, করুণা, ক্ষমা, ধৈয্য, ত্যাগ ও সততাধর্মী জীবনাচারের সাহায্যে প্রকৃতপক্ষে অশুভ ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে পারেন। তাই তান্ত্রিকতার আচার অনুষ্ঠানকে তিনি নিম্নমানের বৃত্তি বা জীবীকা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

প্রশ্নঃ- কিছু তান্ত্রিকতা কায্যকরী বলে শোনা যায়, তাই নয় কি?

উত্তরঃ লক্ষ্য করবেন, যাঁরা ঐ পন্থায় জীবিকা নির্বাহ করেন, তাদের দাবি হলো ভাগ্য পরিবর্তন করে তারা সৌভাগ্যের গ্যারান্টি দিতে পারেন। তাই যদি সত্যি হয়, তাহলে তারা নিজেরা কেন বিপুল সম্পত্তির অধিকারী নন? তাঁরা কেন নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেন না? কেন প্রতি সপ্তায় লটারী জিতে মোটা অর্থ লাভ করেন না? আসল কথা হলো তাদের এইটুকু ভাগ্য যে, কিছু বোকা বা অজ্ঞ মানুষ পাথর কিংবা রক্ষাকবচ ক্রয় করে তাঁদের জীবিকা অর্জনে সাহায্য করেন। এখানে সাধারণ মানুষের মনে অলীক বিশ্বাস ও মোহ সৃষ্টি করে তা স্বার্থসিদ্ধির কজে লাগানো হয়।

প্রশ্নঃ- ভাগ্য বলে কি কিছুই নেই?

উত্তরঃ ভাগ্য বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করেন, এমন অদৃশ্য শক্তিকে, যা খেয়াল খুশিমত মানুষের ভাল-মন্দ নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শন ও বিজ্ঞানের কার্যকারণ প্রক্রিয়া মতে জগত জীবনে সুনিদিষ্ট কারণ ছাড়া কোন ঘটনা ঘটে না। এখানে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কোন অবকাশ নেই। দুর্বল প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে রোগাগ্রস্ত হয়। এখানে সুনির্দিষ্ট রোগ হলো ঘটনা; সুনির্দিষ্ট রোগ জীবাণু এবং দুর্বল প্রতিরোধ ক্ষমতা হলো কারণ। চিকিৎসার সাহায্যে কারণ দূর করলে রোগ নিরাময় হয়। এখানে রোগ জীবাণু ও ঔষধ এই দুইটি জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভেদাভেদ করে না। তান্ত্রিক শাস্ত্রের কোন কাগজের টুকরো বা ধাতব পদার্থ খন্ড, কিংবা পাথরে লিখা কোন ধর্মীয় বাণী কিংবা পাঠ করে মন্ত্র ধারণ করলেরোগ প্রতিরোধ বা নিরাময়ে কার্যকরী হবার কোন কারণ নেই। মানুষের কুশল অকুশল ঘটনার কারণ হলো- মানুষের কৃত কুশল-অকুশল জীবনাচরণধর্মী কর্ম। যাঁরা

অলৌকিকতার ভাগ্যে বিশ্বাস করেন, তাঁরা সাধারণতঃ অনিয়ন্ত্রিত অর্থ-সম্পদের চাহিদার পেছনে অন্তহীন অসন্তুষ্টি নিয়ে ছুটে চলেন। বুদ্ধ বলেছেন, "সুশিক্ষিত, সুদক্ষ, বিভিন্ন বিষয়ে সুনিপুণ এবং সুভাষী হওয়া উত্তম মঙ্গলকারক, পরম সৌভাগ্যদায়ী।

মাতা-পিতার সেবা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভরণ পোষন, সাধাসিধে জীবন যাপন করা উত্তম মঙ্গল, পরম সৌভাগ্যদায়ী।

ত্যাগী হওয়া, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, অভাবগ্রস্তদের সাহায্য এবং নিদোর্ষ কর্মসম্পাদন করা উত্তম মঙ্গল, পরম সৌভাগ্যদায়ী।

কৃতজ্ঞ, সন্তুষ্ট, শ্রদ্ধাবান, বিনম্রী মানবতাবোধ হওয়া, সদ্ধর্ম শ্রবণ করা উত্তম মঙ্গল এবং পরম সৌভাগ্য দায়ী। উক্ত কর্মক্রিয়াই মানুষের শুভ-অশুভ ফলাফল প্রদান করতে সক্ষম; অন্য কিছু নয়"।

[*** অসৎ বন্ধুর সঙ্গ বর্জন করো, সৎ বন্ধুর সঙ্গলাভ করো, মহৎ ব্যক্তির সংস্পর্শে গমন করো।***

*** যিনি পন্ডিত ও প্রবীন ব্যক্তিদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করেন, তিনি দীর্ঘায়ু, যশ, সুখ, শান্তি- সম্পদ লাভ করেন।***]

....
....

বৌদ্ধ ধর্মান্তর প্রসঙ্গে

প্রশ্নঃ- আমি যদি বৌদ্ধ হতে চাই, তাহলে আমাকে কী করতে হবে?

উত্তরঃ একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই। বুদ্ধের সময়ে উপালী নামে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী একজন বিখ্যাত পন্ডিত যুক্তি তর্কে বুদ্ধকে পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে বুদ্ধের কাছে যান। বিভন্ন বিষয়ে আলোচনার পর তিনি বুদ্ধের দর্শন পর্যলোচনায় মুগ্ধ হয়ে নিজেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে বুদ্ধের অনুসারী হতে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা বুদ্ধকে জানালে বুদ্ধ উপালীকে বলেনঃ

যে কোন কাজ তাড়াহুড়া করে করা উচিত নয়। সব কাজ ধীরে ধীরে নির্ভূল ভাবে করা উচিত। প্রথমে সম্যকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করুন; তাড়াহুড়া না করে এই বিষয়ে আরও প্রশ্ন করার অবকাশ নিন। আপনার মতো একজন

খ্যাতিমান পন্ডিতের জন্য এটি বিশেষ প্রয়োজন। যথার্থ বিচার বিশ্লেষণ না করে সিদ্ধান্ত নেয় সমীচিন নয়।

উপালী বলেছেন, "বুদ্ধ আমাকে সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে ঐভাবে বলাতে আমি বুদ্ধের প্রতি আরও মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমি অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে সারা নগরে প্রচার-পত্র বিলি করে বিখ্যাত পন্ডিত উপালীর ধর্মান্তরিত হবার খবর প্রচার করে নিজ ধর্মের মহিমা প্রকাশ করা যেত। কিন্তু বুদ্ধ তা না করে আমাকে তাঁর দেশিত ধর্ম অবলম্বনের আগে গভীরভাবে যুক্তি, বিচার, বিশ্লেষণের উপদেশ দিলেন" [মধ্যম নিকায়২য় খন্ড পৃঃ৩৭৯]।

বৌদ্ধদর্শন বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে কোন বিষয়কে বুঝার বিষয়টিকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যে কোন কাজ সময় নিয়ে, ধীরে-সুস্থে, তাড়াহুড়া না করে সম্পাদন করতে বুদ্ধ আনুসারীদের উপদেশ দিয়েছেন। বিপুল সংখ্যায় অনুসারী সৃষ্টি করতে তিনি কখনও আগ্রহী ছিলেন না। বরং যাঁরা তাঁর অনুসারী হচ্ছেন, তাঁরা বিচার বিশ্লেষন করে গ্রহণ করছেন কিনা, সেই ব্যাপারে তিনি উদ্বিগ্ন থাকতেন।

প্রশ্নঃ- আমি নিজে এই বিষয়ে বিশ্লেষন করেছ; বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করতে এখন আমার কি করা প্রয়োজন?

উত্তরঃ এ ব্যাপারে আমার পরামর্শ হলো- আপনি প্রথমে কোনও বৌদ্ধ বিহারে বা বৌদ্ধধর্মীয় কর্মী সংগঠনে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করুন ও বৌদ্ধ দর্শন, বৌদ্ধ জীবনাচার সম্পর্কে আরও জানার চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। তারপর যখন মনে হবে আপনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত, তখন আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রিরত্নের শরণ নিয়ে বৌদ্ধ হবেন।

প্রশ্নঃ- ত্রিশরণ কি?

উত্তরঃ শরণ হলো আশ্রয়স্থল যেখানে বিপদগ্রস্থ মানুষ নিরাপত্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। আশ্রয়স্থল নানা প্রকারের- অসুখী হলে মানুষ আশ্রয় নেয় বন্ধুবান্ধবের। মৃত্যপথযাত্রী মানুষ আপন বিশ্বাস অনুযায়ী স্বর্গে আশ্রয় কামনা করেন। বুদ্ধের মতে ঐ ধরণের কোন আশ্রয়স্থল নয়। কারণ ঐ সব আশ্রয়স্থল প্রকৃত স্বস্তি ও শান্তির নিরাপত্তা দিতে পারে না।এই প্রসঙ্গে বুদ্ধের উক্তি-

"চতুরার্য সত্যে অর্থাৎ দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ রোধ এবং দুঃখ রোধের উপায়, আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘের আশ্রয় গ্রহণ করলে মানুষ সকল প্রকার দুঃখ থেকে অব্যহতি পান। কার্যকারণ ভিত্তিক নয়, এইরূপ আশ্রয় স্থলে আশ্রয় নিতে আপাতদৃষ্টিতে নিরাপত্তা বোধ হয় বটে, সেই আশ্রয়স্থল প্রকৃতপক্ষে নিরাপদ আশ্রয় নয়। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই তিন আশ্রয়স্থল সবোর্ত্তম আশ্রয়স্থল। কেননা, এটি মঙ্গলামঙ্গল কার্যকারণ প্রক্রিয়াজাত। বুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণের অর্থ, বুদ্ধের মতো অজ্ঞতার অন্ধকার মুক্ত হয়ে জ্ঞানালোকে আলোকিত হতে উদ্বুদ্ধ হবার আশ্রয়স্থলে গমনোদ্যোগ। ধর্মে আশ্রয় গ্রহণের অর্থ, প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষিত,সুব্যখ্যাত, সর্বকালীন, সার্বজনীন প্রকৃত সুখশান্তিপ্রদ বুদ্ধের দেশিত জীবনাচরণে উদ্বুদ্ধ হবার গমনোদ্যোগ। সংঘে আশ্রয় গ্রহণের অর্থহলো, যাঁরা শ্রদ্ধার পাত্র এবং বুদ্ধ ও ধর্ম বিষয়ে সুপন্ডিত, সদাচারী, যাঁরা শ্রদ্ধার পাত্র এবং বুদ্ধ ও ধর্মের ব্যাখ্যা সহজভাবে ও বোধগম্য করে প্রচার করেন, তাঁদের উপদেশাদি ও জীবনাচারণে অনুশীলনোদ্যোগ গ্রহণ"। [ধম্মপদ পৃঃ১৮৯-১৯২]

প্রশ্নঃ- ত্রিরত্নের আশ্রয় গ্রহণের পর আপনার জীবনে কি কি পরিবর্তন এসেছে?

উত্তরঃ বুদ্ধের শিক্ষা ২৬০০ বছরে সময় ব্যাপী কোটি কোটি মানুষের মতো আমাকে জগত জীবনের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে জীবন জগতের নিত্য দুঃখ যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জীবনাচরণ অনুশীলন করে জীবনের দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানতে সাহায্য করেছে। বুদ্ধ নির্দেশিত মানবিক, নৈতিক ও সংযত জীবন যাপন করলে জীবন কিরূপ পবিত্র ও আনন্দময় হয়ে উঠে, তা উপলদ্ধি করতে পেরেছি। আমি এতে প্রশান্ত ও শুদ্ধ জীবন যাপন করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। বুদ্ধকে উদ্দেশ্য করে একজন কবি নিবেদন করেছেনঃ- তাঁর কাছে আশ্রয় নিতে যাওয়া, তাঁর প্রশংসাস্তুতি, তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং প্রচারিত ধর্মের অনুশীলন করার মাধ্যমে তাঁর বাণীকে সম্যকভাবে বুঝে নেবার সুযোগ ঘটে এবং এক অনাবিল প্রশান্তি ও আনন্দে জীবন ভরে ওঠে।

প্রশ্নঃ- আমার এক বন্ধু তাঁর ধর্মে আমাকে ধর্মান্তরিত করতে চান।কিন্তু আমি তাঁর ধর্ম গ্রহণ করতে আগ্রহী নই। এই অবস্থায় কি করা যায়?

উত্তরঃ প্রথমতঃ বুঝতে হবে ঐ ব্যক্তি আপনার প্রকৃত বন্ধু কিনা? একজন প্রকৃত বন্ধু আপনাকে আপনার মতো করে আপনার রুচি, বিশ্বাস, আচরণকে যথোচিত সম্মান করবেন। আমার মনে হচ্ছে, আপনার ঐ বন্ধু আপনার বন্ধু হবার ভান করে আপনাকে ধর্মান্তরিত করতে চাচ্ছেন। যাঁরা নিজের মতামত অন্যের উপর চাপিয়ে দেন, তাঁরা প্রকৃত বন্ধু হতে পারেন না।

প্রশ্নঃ- তিনি আমাকে তাঁর ধর্মীয় অনুভূতির অংশীদার করতে চান। এখানে আপনার অভিমত কি?

উত্তরঃ নিজের মতের সঙ্গে বন্ধুকে অংশীদার করা ভালো। কিন্তু আপনার বন্ধু ধর্মানুভূতির অংশীদারী করা এবং চাপিয়ে দেয়ার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পাচ্ছেন বলে মনে হয় না। ব্যাপারটি অনেকটা এই রকমঃ মনে করুন, আমার একটি আপেল আছে। আমি এর অর্ধেক আপনাকে কেটে দিলাম, বাকীটা আমি খেলাম। এখানে ব্যাপারটি অংশীদারী। কিন্তু আমি যদি গোটা আপেলটিখেতে খেতে আপনাকে অর্ধেক আপেলের অংশীদার হতে বলি, তাহলে তা অংশীদারী করার প্রস্তাব হতে পারে না। অনেকে আপনার বন্ধুর মত ভান করে নিজের হীনস্বার্থ উদ্ধার করতে চেষ্টা করেন। এইরূপ ব্যক্তির কাছ থেকে সাবধান থাকা নিরাপদ।

প্রশ্নঃ- তাহলে কি করে আমার বন্ধুকে থামানো যায়?

উত্তরঃ কাজটি সহজ। আপনি কি করতে চান প্রথমে সিদ্ধান্ত নিন। তারপর আপনার বন্ধুকে স্পষ্টভাবে তা বলে দিন। এরপরেও যদি তিনি আপনাকে সঙ্গে নিতে চান, তখন বিনীতভাবে বলুন, আপনার প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ; কিন্তু আমি আপনার ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে চাই না।

‘কেন চান না?’

‘সেটি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।’

‘আমি বন্ধু হিসেবে আপনাকে আমার সঙ্গে নিতে চাই’।

‘আমার ব্যাপারে আপনার আগ্রহের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আপনার সঙ্গে যেতে আগ্রহী নই’।

উপরে সাজানো কথোপকথনের মহড়ার মতো বারবার ধৈর্য্যের সঙ্গে বিনীতভাবে আপনার অনিচ্ছার কথা বলতে থাকলে, অবশেষে তিনি ক্ষান্ত হবেন। বন্ধুর সঙ্গে ঐভাবে কথোপকথনের ব্যাপারটি বিব্রতকর বটে, কিন্তু ঐপরিস্থিতিকে ঐভাবে সামলানো ছাড়া উপায় নেই।

প্রশ্নঃ- বৌদ্ধদের কি উচিত অন্য ধর্মবলম্বীদের তাঁদের সদ্ধর্মে অংশীদার করার চেষ্টা করা?

উত্তরঃ তা করতে কোনও বাধা নেই। কারণ কোনও মতবাদে অংশীদার করা এবং চাপিয়ে দেয়ার পার্থক্যটি বৌদ্ধেরা বুঝতে পারেন বলে আমার বিশ্বাস। কেউ বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হলে, এমনকি জানতে না চাইলেও স্থান কাল পাত্র বিশেষে বিচার করে বুদ্ধের শিক্ষার কথা বলা যেতে পারে। তবে যদি লক্ষ্য করা যায়,শ্রোতা আপনার কথা শুনতে আগ্রহী নন্, বরং তিনি নিজ ধর্ম সম্পর্কে অতি উৎসাহী, সেক্ষেত্রে তাঁর ধর্মের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে আপনার অভিমত সম্বন্ধে বক্তব্য প্রদান করা থেকে বিরত থাকা বাঞ্চনীয়। মনে রাখবেন, সদ্ধর্ম প্রচারণার জন্য ধর্মোপদেশের জন্য জীবনাচরণের মাধ্যমে সদ্ধর্মের প্রচার অধিকতর কার্যকরী। শুধু কথায় নয়, কায়-মনো-বাক্যের মাধ্যমে, সদ্ধর্মের অন্তর্নিহিত মৈত্রী-করুণা-ক্ষমা-সহনশীলতা-ত্যাগের কথা নিজের জীবনাচরনের মাধ্যমে চার পাশের মানুষের কাছে প্রচার করুন।

যদি আমরা সবাই বৌদ্ধ দর্শনের মর্মবাণী সম্যকভাবে বুঝতে পারি এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলনে প্রয়াসী হই, ঔদার্যের মনোভাব নিয়ে অন্যদের অনুপ্রাণিত করি, তাহলে তা আমাদের এবং অন্যদের মহামঙ্গল সাধন করবে।
[*** ঝড় তুফানের এলোপাথারী ঝাপ্টায় যেমন ভারী শিলাখন্ড অনড় থাকে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা তেমনি সংসারের নিন্দা-প্রশংসার অকম্পিত হৃদয়ে সংসারে বিচরণ করেন।***]

[***গভীর জলাকীর্ণ হ্রদ যেমন স্ফটিকের স্বচ্ছতায় প্রশান্ত হয়ে বিরাজমান থাকে, প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি তেমনি সদ্ধর্ম জ্ঞাত হয়ে অপ্রমেয় শান্তিতে বসবাস করেন।***]

[***ক্রোধকে অক্রোধ এবং শত্রুতাকে মৈত্রী দিয়ে,

ঈর্ষাপরায়নতাকে ক্ষমা দিয়ে জয় করিবে।

যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ যোদ্ধাকে পরাজয় করা অপেক্ষা

যিনি নিজের লোভ, দ্বেষ, মোহাদি রিপুকে

মুদিতা ও উপেক্ষার দ্বারা জয় করেছেন,

তিনিই প্রকৃত বিজয়ী বীরযোদ্ধা।***]

....
....